প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬৬

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শিখা চৌধুরী
রূপা প্রেস
২০৭এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

প্রীতিভাজনেষু

সূচীপত্র

পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী

একদা রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী ছিলেন পূর্বসূরী, আমরা 'প্রবাসী', 'ভারতী' ও 'সবুজপত্রে'র পাঠক ও লেখকরা ছিলুম তাঁদের উত্তরসূরী। এখন আমরাই হয়েছি পূর্বসূরী, কিন্তু আমাদের উত্তরসূরী কারা তা আমরা বলতে পারব না। অন্তত আমি তো কারো নাম করতে পারছিনে। কথাটা আরো স্পষ্ট হবে যখন আমি নিজের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দিতে চেষ্টা করব।

আমার পূর্বসূরীদের অন্বিষ্ট ছিল প্রাচ্য ও প্রচীত্যের মিলন। প্রাচ্য বলতে তাঁরা বুঝতেন প্রাচীন ভারত আর প্রতীচ্য বলতে আধুনিক ইউরোপ। তাঁদের কাছে প্রাচীন ভারত মহান হলেও আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়, সুতরাং আধুনিক ইউরোপকে তার চাই। এটা ইউরোপের স্বার্থে না হোক, ভারতের স্বার্থে। এখন এই জায়গাটিতেই জাতীয়তাবাদীদের আপত্তি ছিল। আমাদের সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে ইউরোপের যদি গ্রহণযোগ্য কিছু না থাকে তবে ইউরোপের সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে আমাদেরই বা গ্রহণযোগ্য কিছু থাকবে কেন? ইউরোপ যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে আমরাই বা কেন ওদের পাত্তা দেব? দৈহিক অর্থে ওরা আমাদের জয় করেছে বলে কি মানসিক অর্থেও জয় করবে? মনে প্রাণে যদি ওদের দাস হই তবে কি কোনোদিন আমরা স্বাধীনতা ফিরে পাব? এর নাম সম্মানজনক সমন্বয় নয়, এটা 'দাস মানসিকতা'।

'দাস মানসিকতা' বিরোধী ঢেউ যখন ওঠে তখন প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের মিলনের কল্পনা কোথায় ভেসে যায়। আগে তো দেশ স্বাধীন হোক, তার পরে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে স্বাধীন ইউরোপের মিলনের কথা ভাবা যাবে। কিন্তু স্বাধীনতা

যাকে বলা হচ্ছে সেটারই বা স্বরূপ কী? সেটাও কি ইউরোপীয় অর্থে স্বাধীনতা নয়? ইটালীর স্বাধীনতার মতো উচ্চবর্ণের স্বাধীনতা কি ভারতের কাম্য? গান্ধীজী বলেন, না, ওটা সত্যিকার স্বাধীনতা নয়। 'হিন্দ্ স্বরাজ' লিখে তিনি তাঁর স্বরাজের সংজ্ঞা দেন। তাঁর ঝোঁকটা জনগণের স্বাবলম্বনের উপরে। জনগণের স্বশাসনের উপর। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর দৃষ্টান্ত তিনি খোদ ইংলণ্ডে দেখে হতাশ। আর ওদেশের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশন তাঁর চোখে সভ্যতাই নয়। আমি তো বিষম দোটানায় পড়ে যাই। এসব যদি বর্জন করি তো ইউরোপের আর বাকী থাকে কী! সমন্বয়টা তা হলে কিসের সঙ্গে হবে? আর স্বরাজ থেকে যদি এসব বাদ পড়ে তবে স্বরাজের জন্যেই বা কেন আমি জীবনপাত করব? জনগণের স্বাবলম্বন ও স্বশাসনের জন্যে জনগণই সংগ্রাম করুক। অথচ এটাও তো ঠিক যে পরাধীনতার অবসান দেশসুদ্ধ সকলেরই কাম্য। চীন যদি স্বাধীন দেশ হয়, জাপান যদি স্বাধীন দেশ হয়, ইরান ও আফগানিস্থান যদি স্বাধীন দেশ হয় তবে ভারতই বা না হবে কেন? দেশে বিদেশে আমরাই বা কেন ব্রিটিশ প্রজা বলে পরিচয় দেব? আর স্বাধীন দেশ হলে আমাদের রেল স্টীমার কলকারখানা থাকবে না, এই বা কেমন কথা? আর্মি নেভি থাকবে না তো দেশরক্ষা করবে কে? নিরস্ত্র জনগণ?

প্রাচ্য প্রতীচ্য সমন্বয়বাদীদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের, জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে গান্ধীবাদীদের পার্থক্য দিন দিন প্রকট হয়। আমি একবার এ শিবিরে যাই, একবার ও শিবিরে যাই, একবার সে শিবিরে যাই। কোথাও স্থির থাকতে পারিনে। আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে আমার ছিল একটা নাড়ীর টান, মূল ইংরেজীতে তথা বাংলা অনুবাদে ইউরোপীয় সাহিত্য পড়ে আমি তার সঙ্গে একপ্রকার সাযুজ্য অনুভব করেছিলুম। কাউকেই আমার অনাত্মীয় মনে হতো

না। না শেক্‌সপীয়ারকে বা স্কটকে, না টলস্টয়কে বা ডিকেন্সকে, না মোপাসাঁকে বা চেখভকে, না ওয়ার্ডসওয়ার্থকে বা শেলীকে। ওঁরা যে বিদেশী একথা ভাবতে আমার অন্তরের অনিচ্ছা। মানুষ হয়ে আমি জন্মেছি, এটাই বৃহত্তর সত্য। ভারতীয় হয়ে জন্মেছি, এটা ক্ষুদ্রতর সত্য।

অথচ স্বদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে আমি স্বাধীনতাকামীদের সঙ্গে। এক এক করে সব ক'টা সাম্রাজ্য ভেঙে গেল বা যাচ্ছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই কি অটুট? প্রথম মহাযুদ্ধের পর পোলাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশ স্বাধীনতা পায়। ভারত কেন পাবে না? সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ছিল। স্বাধীন ইটালী শেষকালে কিনা ফাসিস্ট বনে গেল। স্বাধীন ভারতও কি ফাসিস্ট বনে যাবে না, যদি ইটালীর অনুসরণ করে? গান্ধীজী অকারণে ইটালীয় স্বরাজের থেকে ভিন্ন ধাঁচের স্বরাজ—হিন্দ্ স্বরাজ—চাইছেন না। গান্ধীজীর স্বরাজ কখনো মুসোলিনীর স্বরাজ হবে না। কিন্তু পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর উপরেও আমার স্বাভাবিক পক্ষপাত ছিল, সেটা ইংলণ্ডের ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে। সাহিত্যের পর ইতিহাসই আমার অনুরাগ। এক এক সময় সাহিত্যের চেয়েও বেশী। দেশের জন্যে আমি কেবল স্বাধীনতা চাই তা নয়, পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীও চাই। সেক্ষেত্রে ইংরেজরা শত্রু নয়, গুরু। আর আধুনিক যুগে ফলিত বিজ্ঞান কি কেউ এড়াতে পারে? দেশে যদি লোহা থাকে তবে ইস্পাতের কারখানাও থাকবে। আর যিনি যাই বলুন, আক্রমণের সময় সশস্ত্র সৈন্যই কাজে লাগবে বেশী, অহিংস অসহযোগীর পালা পরে, যদি যুদ্ধে হার হয়।

তিনটে শিবিরের সঙ্গে যোগ দেয় আরো একটা শিবির। সেটা মার্কসবাদী। তার সঙ্গে আমার কোনোপ্রকার সাযুজ্য ছিল না।

ভারতের পক্ষে সেটা শ্রেয় বলেও মনে হতো না। ইতিহাসের অমোঘ বিধানে অবশ্যম্ভাবী বলেও আমি বিশ্বাস করতুম না। অথচ ত্রিশের দশকে লক্ষ করি ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের, জার্মানীর তথা ভারতের বুদ্ধিজীবীরা কেউ লাল, কেউ গোলাপী রঙে মন রাঙিয়েছেন। আমার মনের রংটা তা হলে কী? কালো, না ধূসর, না বাদামী, না সাদা? একটা না একটা ইডিওলজি না হলে কি বুদ্ধিজীবী হওয়া যায়? আমি কি কমিউনিস্ট, না সোশিয়ালিস্ট, না ক্যাপিটালিস্ট, না ফ্যাসিস্ট? আমার প্রবণতটা অ্যানারকিজমের দিকে, যেমন কবি চিত্রকর গায়ক বাদকদের হয়। কিন্তু সেটার সঙ্গে ভায়োলেন্স এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে তার থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে না পারলে লোকে ভুল বুঝবে। তখন আমি তার সঙ্গে নন্‌ভায়োলেণ্ট বিশেষণটি জুড়ে দিই। তার মানে আমি অহিংস নৈরাজ্যবাদী। সংশয়শীলরা বলবে, সোনার পাথরবাটি। যে যা বলে বলুক, আমি কিন্তু ইডিওলজি হিসাবে ওর চেয়ে ভালো কিছু খুঁজে পাইনি। হয়তো ওর দু'শো বছর দেরি আছে। তা হলে তো আমি দু'শো বছর এগিয়ে রয়েছি। ইতিহাস তো আজ এখনি শেষ হয়ে যাচ্ছে না। বিংশ শতাব্দীই তো শেষ শতাব্দী নয়। আজ যেটা অবাস্তব আজ থেকে দুই শতক পরে সেটাই হতে পারে বাস্তব।

উত্তরসূরীদের যদি কিছু দিয়ে যেতে হয় তাহলে আমি দিয়ে যাব অহিংস নৈরাজ্যবাদ। এটা ইডিওলজি হিসাবে। এ ছাড়া সেই যে প্রথম সম্পাদ্য সেটাও পূর্বসূরীদের হাত থেকে নিয়ে উত্তরসূরীদের হাতে তুলে দিয়ে যাব। প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের মিলন এখনো ঘটেনি। এখন তো আর 'দাস মানসিকতার' প্রশ্ন ওঠে না। আমরা এখন ইংরেজ ফরাসীদের মতোই স্বাধীন। জাতীয়তাবাদী ও গান্ধীবাদী এই দুই শিবিরের মধ্যে মীমাংসা গান্ধীজী থাকতেও হয় নি, এখনও হচ্ছে না। কবে হবে কেউ বলতে পারে

না। আমি এ নিয়ে অনেক ভেবেছি, অনেক লিখেছি। কিন্তু কোথাও তেমন মাথাব্যথা দেখছিনে। আর মার্কসবাদী শিবির তো এখন দুনিয়ার বহু দেশ জয় করে বর্ধিষ্ণু হয়েছে। তার প্রেস্টিজ এখন তুঙ্গে। তার নামটা না হোক, আদর্শটা তো আজকাল মুখে মুখে। অগ্নিপরীক্ষার দিন দেখতে পাওয়া যাবে কে কতদূর রক্তপাত সমর্থন করবেন। বিনা রক্তপাতে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে খতম করতে পারবে না। আইনসম্মত সংস্কারকে বিপ্লব বলে না। আমার উত্তরসূরীরা যদি বিপ্লবী হয় তবে আমি তাদের পূর্বসূরী হই কী করে?

আর্ট বড়ো না ইডিওলজি বড়ো? এ প্রশ্ন আমার জীবনে বার বার উদিত হয়েছে। জাতির দিক থেকে, সমাজের দিক থেকে ইডিওলজি যতই গুরুতর হোক না কেন, মানুষের রূপবোধ ও রসবোধকে তৃপ্ত করা তার সাধ্য নয়। যার সাধ্য তার নাম আর্ট। ইডিওলজির ময়দানে লক্ষ লক্ষ জনের ডাক পড়ে। তারা সবাই মনোনীত হয়। কিন্তু আর্টের আঙিনায় যাদের ডাক পড়ে তারা শত শত হলেও তাদের ভিতর থেকে মনোনীত হয় মাত্র কয়েকজন। মনোনয়ন করেন সরস্বতী। অনুমোদন করে মহাকাল। ইনি ন্যাশনালিস্ট বা উনি মরালিস্ট বা তিনি সোশিয়ালিস্ট বলে যে সরস্বতীর মনোনয়ন পাবেন বা মহাকালের অনুমোদন, এটা উচ্চাশা। সামান্য একজন কারিগরও এঁদের চেয়ে বেশী আশা করতে পারে। যদি নিজের কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে করে যায়।

আমি নিজেই বুঝি যে আমার নিজের কাজ হচ্ছে রস ও রূপসৃষ্টি, অথচ সেই কাজে আমার নিষ্ঠার অভাব হয়েছে। আমি নিরুপায়। আমার ভিতরে গোটের মতো এক daimon আছে। না, দানব নয়, এর অন্য বানান, অন্য অর্থ। সেই অদম্য শক্তি আমার হাত চেপে ধরে আমাকে দিয়ে যা লিখিয়ে নেয় তা আর্ট নয়। তবু সেও

একদিক থেকে শ্রেয়। আমিও ইতিহাসের হাতের পুতুল। পুতুলনাচের ইতিকথায় আমারও একটা অংশ আছে। হয়তো অকিঞ্চিৎকর। তবু তা আমারই। সে কাজ আর কাউকে দিয়ে হলে আমাকে দিয়ে করানো হতো না। এখানে আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে আমার ভিতরকার সেই ডাইমন বাইরের কোনো ব্যক্তি বা দল বা গোষ্ঠী নয়, যার আমি বাহন বা ভৃত্য বা পুত্তলিকা। যদি সাংবাদিক হতুম তা হলে হয়তো তাই হতুম। হবার সাধ ছিল, সাধ্যও ছিল, কিন্তু আমার নিয়তি আমার কান ধরে সংবাদপত্রের অফিস থেকে কলেজে নিয়ে গেছে, সেখান থেকে সিভিল সার্ভিসে। নিজে বিড়ম্বিত হয়েছি, কিন্তু পাঠকদের বিড়ম্বিত করিনি। যেখানে আমি স্রষ্টা বা শিল্পী নই সেখানে আমি মানবিকবাদী ও অতন্দ্র প্রহরী। বাল্যকালে পড়েছিলুম, "Eternal vigilance is the price of Liberty." সেটা আমার জীবনের সাথী হয়েছে।

গান্ধীজীর উক্তি "আমার জীবনই আমার বাণী"। আমি তো ওকথা বলতে পারিনে। আমি বলব, "আমার বাণীই আমার জীবন।" আমার বাণীর জন্যেই আমি বেঁচে আছি ও বেঁচে থাকতে চাই। গর্ভধারণের মতো এটাও একটা দায়, মহাদায়, মহত্তর দায়। এর থেকে মুক্ত না হয়ে মুক্তি নেই আমার। লিখি আর লিখে মুক্তি পাই। অন্তঃসত্ত্বা যেমন মুক্তি পায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে।

॥ ২ ॥

বারো তেরো বছর বয়সে যেমন রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব শুরু তেমনি ষোল সতেরো বছর বয়সে টলস্টয় ও গান্ধীর। কিন্তু প্রথমোক্ত দু'জনের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যেমন নির্বিরোধ দ্বিতীয়োক্ত দু'জনের সঙ্গে তেমন নয়। এঁদের সঙ্গে আমি মনে মনে

দ্বন্দ্বরত হয়েছি। দীর্ঘকাল ধরে চলেছে সেই দ্বন্দ্ব। অবশেষে এসেছে সন্ধি ও প্রত্যয়।

কতকগুলো ফাণ্ডামেণ্টাল প্রশ্ন নিয়ে আমি বাল্যকাল হতেই চিন্তাগ্রস্ত। কেন বাঁচব, কেমন করে বাঁচব, কী করব, কেন করব, কেমন করে করব, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, প্রকৃতির সঙ্গে কী সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে কী সম্পর্ক, জীবনের অর্থ কী, সার্থকতা কিসে, প্রেম কী, রস কী, রূপ কী, ধর্ম কী, নীতি কী, ইনটেলেকটের দৌড় কতদূর, ইনটুইশানের কী মূল্য, ইমোশন কি ভালো, ইনস্টিংক্ট কি মন্দ, আত্মা কি অমর, কিসে আমাকে অমৃত করবে, এমনি অসংখ্য জিজ্ঞাসা। সেইসঙ্গে ছিল—রাষ্ট্র না হলে কি চলে না, আদালত, জেল, পুলিশ ও ফৌজ কি অপরিহার্য, রাষ্ট্রহীন সমাজ কি একটা অবাস্তব কল্পনা, রাষ্ট্র যদি থাকে তো তার উপর সওয়ার হবে সমাজ না সমাজের উপর সওয়ার হবে রাষ্ট্র, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের কী সম্পর্ক, রাষ্ট্রের কী সম্পর্ক, কতদূর নিয়ন্ত্রণ মানা উচিত, তারপরে কি অমান্য করাই কর্তব্য, অমান্য করলে সেটা কি হবে সিভিল বা অহিংস, শাসকশক্তি যদি ক্ষমতা ছেড়ে দেয় তার জায়গায় কি বসবে নতুন এক শাসনশক্তি, সে কি পারবে সর্বসম্মতিক্রমে শাসন করতে, কেউ যদি তার নিয়ন্ত্রণ অমান্য করে সেও কি অঙ্কুশ প্রয়োগ করবে, না সে স্বেচ্ছায় গদি ছেড়ে দেবে, তার ফলে যদি এমন অবস্থা হয় যে কেউ কাউকে শাসন করতে পারছে না তখন সেই অরাজকতা কি অসহ্য হবে না, অরাজকতার নীট ফল কি কঠোর সামরিকতা নয়? ক্ষমতা সংক্রান্ত এইসব মূলগত প্রশ্নের মতো ছিল ধন সংক্রান্ত মূলগত প্রশ্ন। ক্যাপিটালিজম, সোশিয়ালিজম, কমিউনিজম, ফাসিজম ইত্যাদি বিবিধ ইজম তো ধন উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ইত্যাদিকে ঘিরে। সামাজিক ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। কতক লোক আর সকলের শ্রমের সুযোগ নিয়ে ধন সঞ্চয় ও নিয়োগ করেছে। তাদের শূন্যতাই

কি সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে ও সে সমৃদ্ধি সমভাগ হলে সকলেই সমৃদ্ধ হবে ?

এসব প্রশ্নের উত্তরে গান্ধী ও টলস্টয় যা বলেছেন তারই গুরুত্ব ছিল আমার কাছে সব চেয়ে বেশী। যদিও অবিসংবাদিতরূপে নয়। কতরকম মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে মার্কসবাদের প্রতিও আকৃষ্ট হই। রুশবিপ্লবের সাফল্যের মূলে ছিল মার্কসবাদ। সেই থেকে তার হঠাৎ উপজাত প্রেস্টিজ। আবার চরম প্রতিক্রিয়াও। সমাজের শিকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে চাইলে বিপ্লবের পরে প্রতিবিপ্লব অনিবার্য। তার মাশুল তো কোটি কোটি প্রাণের বিনাশ। অবশ্যম্ভাবী প্রতিবিপ্লব যদি এড়াতে হয় তবে তার আগে সম্ভবপর বিপ্লব এড়াতে হয়। শ্রেয় সত্যাগ্রহ।

গান্ধী-টলস্টয়কেও আমি আমার পূর্বসূরী মনে করি ও নিজেকে তাঁদের উত্তরসূরী। কিন্তু আমার নৈতিক-রাজনৈতিক জীবনে এঁদের প্রভাবই প্রবলতর হলেও সারস্বত-সাহিত্যিক জীবনে আমি রবীন্দ্র-প্রমথ ঐতিহ্যের উত্তরসাধক। আমার এই দুই পরম্পরাকে আমি মেলাতে চেষ্টা করেছি। পুরোপুরি মেলাতে পারিনি। রসসৃষ্টি ও রূপসৃষ্টি যখন করি তখন গান্ধী-টলস্টয়ের দিকে তাকাইনে, তাকালে তাকাই সেই টলস্টয়ের দিকে যিনি 'সমর ও শান্তি' আর 'আনা কারেনিনা' লিখে বিশ্বসাহিত্যে স্থান করে নিয়েছিলেন। আগে শিল্পীর আসনটা অর্জন না করলে পরবর্তী বয়সের ঋষি টলস্টয়কে চিনত কে ? তাঁর কথা শুনত কে ? আমার কথাও কি শুনবে, যদি না তাঁরই মতো সৃষ্টি করে তাঁরই মতো আসন করে নিতে পারি ? গান্ধীজীর মতো অহিংস সংগ্রাম চালিয়ে জনজীবনে অগ্রগণ্য অবস্থিতি অর্জন করতে পারা তো দূরের কথা।

আমার কণ্ঠস্বরের পেছনে না আছে আর্টের দিগ্বিজয়ী কীর্তি, না রাজনীতির ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন। আমার কণ্ঠস্বর নিতান্তই

একটি ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর। মুষ্টিমেয় শ্রোতাকে নিয়ে ঘরোয়া বৈঠকে কথা বললে যেমন হয়। তিনশো জন পড়বে, একশো জন ভাববে, দশ জন বলবে, "ঠিক কথা"। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে লেখার কাজে নিযুক্ত থাকার পর দেখছি আমার পক্ষপাতী পাঠকের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ নয়, সহস্র সহস্র নয়, শত শত বললেও বাড়িয়ে বলা হয়। তবে সংখ্যার অভাব পুষিয়ে নেবার মতো অনুরক্ত পাঠকও যে নেই তা নয়। অবাক হয়ে যাই মাঝে মাঝে তাঁদের দেখা পেয়ে ও কথা শুনে।

দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষানবীশীর পর আমি নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে আমি সারস্বত মহলের লোক ও পেশায় না হোক নেশায় একজন শিল্পী। জীবনে যদি কিছু করে থাকি তো শিল্পের সাধনা। তার আড়ালে রসের সাধনা। এ দুটো এমনভাবে ওতপ্রোত যে বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গেই আমার মেলে বেশী। এক এক সময় মনে হয়েছে আমি তাঁদেরই উত্তরসাধক, রবীন্দ্র-প্রমথর নয়। তবে আমার মধ্যে আধুনিকতার ভাগ এত বেশী যে আমি কিছুতেই আমার যুগকে ভুলতে পারিনে। বিংশ শতাব্দীকে আমি হজম করেছি। বিংশ শতাব্দী করেছে আমাকে হজম। দেশ আর যুগের মধ্যে যদি বেছে নিতে হয় আমি বেছে নেব যুগকে। এই যে যুগকে বেছে নেওয়া এটাই আমাকে একঘরে করেছে। যুগটা পশ্চিমকেন্দ্রিক। তাই আমি পশ্চিমঘেঁষা। দেশপ্রেমিক ও গণদরদী উভয় আসরেই আমি খাপছাড়া। আমার অস্তিত্বটাই অনেকের চোখে দুঃসহ। তবু আমি আমিই।

শিল্পীহিসাবে, বুদ্ধিজীবীহিসাবে আমি পশ্চিমদিকে তাকাই ও পশ্চিমের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিই। তা যদি না করি তবে আমি সেকেলে হয়ে যাই। যেমন সেকেলে ছিলেন মাইকেল-বঙ্কিমের পূর্বসূরী দাশু রায় ও ঈশ্বর গুপ্ত। পূর্বসূরী মনোনয়নে মাইকেল ও

বঙ্কিম দু'জনেই হয়েছেন পশ্চিমমুখো। একজনের পূর্বসূরী মিলটন, আরেকজনের স্কট। এঁরা আবার প্রাচীন ভারতেরও উত্তরসূরী। কিন্তু পুরোনো বোতলে ভরেছেন নতুন মদ। এঁদের পরে আরো একদল এলেন যাঁদের বোতলটা নতুন, কিন্তু মদটা পুরোনো। রেনেসাঁসের পরের অধ্যায় রিভাইভাল। শব্দ দুটো শুনতে একই রকম কিন্তু দুটোর তাৎপর্য দু'রকম। রেনেসাঁসবাদীরা চেয়েছিলেন স্বকালের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে, সুতরাং বিদেশের সঙ্গে সংযোগ রাখতে। রিভাইভালবাদীরা চেয়েছিলেন স্বদেশের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে, সুতরাং অতীতের সঙ্গে সংযোগ রাখতে। এই দুই বাদের এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র শেষবয়সে রিভাইভালকেই বরণ করেছিলেন, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফিরে যাননি, ফিরেছিলেন প্রাচীন ভারতে। রবীন্দ্রনাথও কিছুদিন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বকালে প্রত্যাবর্তন করেন, পশ্চিমে অভিযান করেন ও নোবেল প্রাইজ নিয়ে ফিরে আসেন পশ্চিম থেকেই।

আমি যে কখনো রিভাইভালের স্বপ্ন দেখিনি তা নয়, কিন্তু আমার মানস-সরোবর প্রাচীন ভারতে নয়, আধুনিক ইউরোপেই। অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনে রবীন্দ্রনাথের মতো আমারও মোহভঙ্গ হয়। তিনি লেখেন 'সভ্যতার সঙ্কট' অর্থাৎ বিশ্বসভ্যতার সঙ্কট। ততদিনে তিনি প্রাচ্য প্রতীচ্যের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন। নইলে বিশ্বকবি হতেন কোন্ সূত্রে? আমি সেদিন সেই সঙ্কটকালে পশ্চিম থেকে অভিনব প্রেরণা আর পাইনি। আমার মতে পশ্চিম একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে। তাহলে কি আমি প্রাচীন ভারত থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করতে হাত বাড়িয়েছি? না, আমার মতে প্রাচীন ভারতের যা দেবার ছিল তা হাজার বছর আগেই ফুরিয়ে গেছে। যেটা ফুরিয়ে যায়নি সেটা তার ধর্ম। ধর্ম আর দর্শনবিজ্ঞান বা কাব্যনাটক এক নয়। এসব বিদ্যার বা কলার বহতা স্রোত ভারতে নয়,

ইউরোপে। কিন্তু ইউরোপ তো আত্মঘাতী। তার দিকে তাকিয়ে কী পেতে পারি ?

তখন আমি তৃতীয় একদিকে দৃষ্টিপাত করি। সেটা আমাদের লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, লোকসংস্কৃতি। তার ধারা আবহমানকাল বহতা রয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহে শুকিয়ে যায়নি। পরাধীনতায় ক্ষীণ হয়নি। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে দীন হয়নি। আমিও কি তার থেকে প্রেরণা পেতে পারিনে ? সেই প্রবাহে যোগ দিয়ে সৃষ্টি করতে পারিনে ?

কিন্তু পরীক্ষানিরীক্ষা করে এই উপলব্ধি করি যে আমার মন সোফিস্টিকেটেড, আমার হাত সোফিস্টিকেড, আমার জীবনযাত্রাকে যতই সরল করে আনি না কেন সেটা কি কখনো জনজীবনের মতো সরল হতে পারে ? উল্টে জনজীবনই জটিল হয়ে উঠছে। বাউলও হচ্ছে সোফিস্টিকেটেড। যাত্রার বিষয় হয়েছেন লেনিন, স্টালিন, মাও ৎসে-তুং, আলেন্দে আর—কী আশ্চর্য—হেলেন অফ ট্রয়। এর পরে হয়তো ক্লিওপেট্রা, মোনালিসা, জোন অব আর্ক, রোজা লুকসেমবুর্গ। লোকসংস্কৃতি যে অভিমুখে চলেছে সেটার কতকটা পলিটিকাল ও কতকটা কমার্শিয়াল। এই ভালগার জিনিসটা কি ফোক আর্ট ? এর থেকে প্রেরণা পাব আমি !

শুধু লোকসংস্কৃতি কেন, কাব্য নাটক গল্প উপন্যাসও তো চলেছে একই পথে। তার কতক পলিটিকাল, কতক কমার্শিয়াল। পলিটিকালের চেয়ে কমার্শিয়ালেরই ভাগ বেশী। ওদিকে সমাজতন্ত্রের নামাবলী, এদিকে মোটা আয়ের পেশাদারি। এটাও একপ্রকার সমন্বয় বইকি। এর অঙ্গে একটু ধর্মের গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলে এর মতো সফল পণ্য আর কী হতে পারে ! পশ্চিমও এ কৌশল জানে না।

People's আর popular দুই এক নয়। যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা পপুলার, কিন্তু পীপলস নয়। এতে বাস্তব যতখানি আছে

তার চেয়ে বেশী আছে কামনাপূরণ। নইলে লোকে কিনবে কেন? কিন্তু এইভাবে যেটা গড়ে উঠছে সেটা জনগণের সাহিত্যও নয়, বিদগ্ধজনের সাহিত্যও নয়। না জনমানসের প্রকাশ, না বিদগ্ধ মানসের সৃষ্টি। বিদগ্ধদের সৃষ্টির ধারা দিন দিন শুকিয়ে গেলেও আমি বিস্মিত হব না, কিন্তু ব্যথিত হব, যদি তার পরিবর্তে জনগণের প্রকাশের ধারা দিন দিন পরিপুষ্ট না হয়। যদি বিদগ্ধ সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে লোকসাহিত্যও নিঃশেষ হয়ে যায়। যদি পীপলস বলতে বোঝায় পপুলার।

বিস্মিত হব না, বলেছি। কেন বিস্মিত হব না? কারণ আজকাল 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'সবুজপত্রে'র মতো মাসিকপত্র নেই, থাকলেও সে উৎকর্ষ নেই। আছে কয়েকখানি ত্রৈমাসিক, কিন্তু তাদের পাঠকসংখ্যা এত কম যে লেখার প্রচার হয় না। প্রচার না হলে লিখে মনও ভরে না, পেটও ভরে না। যাতে প্রচার হয় এমন সাপ্তাহিক আছে, কিন্তু তাদের উপরে হয় সরকারী নিয়ন্ত্রণ, নয় গোষ্ঠীগত হস্তক্ষেপ। দৈনিকপত্রের সাময়িকীর বেলাও একই কথা। পত্রিকায় না ছাপিয়ে সরাসরি বই করে বার করার পথ অবশ্য খোলা, কিন্তু বিজ্ঞাপন না দিলে বই কাটে না, দিলেও তাতে জুয়াখেলার মতো প্রভূত ব্যয়।

যাক আমি তো এখন সত্তর পার হয়েছি। অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে যাওয়াই আমার ভাবনা। আর সব ভাবনা উত্তরসূরীদের।

অধরাবাঁধা

সাংসারিক জ্ঞান হবার আগে, ইংরেজীতে যাকে বলে teen-ager সেই বয়সেই আমি গোটা দুই গুরুতর সিদ্ধান্ত নিই। তার একটা আমার জীবন সম্বন্ধে। আর একটা জীবিকা সম্পর্কে। জীবনে আমি হব ইংরেজীতে যাকে বলে non-conformist আর জীবিকায় যাকে বলে free-lance। এ দুটোর বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া শক্ত।

শুধুমাত্র ধর্মবিশ্বাসে নয়, সামাজিক আচারে বিচারে, দার্শনিক ভাবনায়, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতবাদে, সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণায় আমি গতানুগতিকের সঙ্গে বা বহুলপ্রচলিতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে নারাজ। এমন মানুষের পক্ষে দলভুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। দলভুক্ত হতে বাধ্য হলে দলছুট হতেও বাধ্য হই। কী করব, পায়ে পা মেলাতে পারিনে।

আমার প্রথম সিদ্ধান্তে আমি এখনো স্থির রয়েছি। কিন্তু দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটা ত্যাগ করতে হয়েছে। ফ্রী-লান্স হয়ে এদেশে সংসার করা যায় না। দু'দিন আগে হোক পরে হোক একটি বাঁধা আয়ের চাকরি বা বৃত্তি স্বীকার করতে হয়। এর জন্যে আমি সমস্তক্ষণ ছটফট করেছি। সাহিত্য থেকে এখনো—এই পঞ্চাশ বছরের সাধনার পরেও—উপার্জন যা হয় তাতে একজনের কুলোয় না। একটা পরিবারের তো নয়ই। পেনসন পাই বলেই চলে যায়। না পেলে অভুক্ত দশা হতো।

সমস্যার সমাধানের একটা সূত্র পেয়েছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিন বলেন, "স্থির করেছি বছরে চারখানা করে নভেল আর দু'খানা করে ভ্রমণকাহিনী লিখব। সেই আয়েই সংসার চালাব।" আমি তাঁকে নিরস্ত্র... [illegible] Public [illegible] বা অন্ত

কোনো জীবিকা সাহিত্যিকদের পক্ষে অপচয়কর। কিন্তু বছরে চারখানা নভেল লিখলে যা হয় তার নাম অতিলিখন দোষ। হাত খারাপ হয়ে যাবে। পুনরুক্তি ঘটবে। কোথায় এত অভিজ্ঞতা যে তাই ভাঙিয়ে বছরের পর বছর নভেল লেখা যাবে? বিভূতিভূষণকে আমরা অকালে হারালুম।

তেমনি আরেকজনকেও। তিনি দীপক চৌধুরী। ইনিও একদিন আমাকে ঠিক বিভূতিভূষণের মতোই বলেছিলেন, "বছরে চারখানা করে নভেল লিখব। সেই আয়েই সংসার চলবে।" তাঁকেও আমি নিবৃত্ত হতে বলি। ওতে ওঁর লেখার উৎকর্ষ হ্রাস পাবে। মূল্যও কমে যাবে। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর স্ত্রী ছিলেন সরকারী কলেজের অধ্যাপিকা। সন্তানও হয়নি, সুতরাং পারিবারিক দায়িত্ব কতটুকু!

ওই যে বছরে চারখানা নভেল লেখার আর্থিক প্রয়োজন সেটা আমি অনুভব করি, যখন চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবি। আমার অভিজ্ঞতার পুঁজি তো আরো কম ছিল। আর বানিয়ে বানিয়ে লেখা তো আমার নীতি নয়। টলস্টয়ের কাছে শিক্ষা বানিয়ে বানিয়ে না লেখা। তা ছাড়া আমি যাই লিখি না কেন স্টাইলটা আমার ও স্টাইলটাই আমি। স্টাইলের ক্ষতি না করে রাশি রাশি লেখা যায় না। বছরে চারখানা নয়, চার বছরে একখানা লিখতে পারলেই আমি কৃতার্থ। কিন্তু সেটা তো অর্থকরী পন্থা নয়। হতে পারে বিদেশে। যেখানে পাঠকসংখ্যা লাখো লাখো। শুনতে পাই সেখানেও আজকাল সে সুদিন নেই। সাহিত্যিকরা নানান ধান্ধায় লিপ্ত।

ফ্রী-লান্স হতে বদ্ধপরিকর হলে বিয়ে করা চলে না, বিয়ে করলে এমন একজনকে করতে হয় যাঁর নিজের একটি জীবিকা বা পৈত্রিক সম্পত্তি আছে। তা হলে আবার প্রেমের পরিসর খর্ব হয়। প্রেমে যারা পড়ে তারা কি অত হিসাব করে পড়ে? আমি তো কৃতসংকল্প

ছিলুম যে প্রেমে না পড়লে বিয়েই করব না। ওটা আমার তৃতীয় সিদ্ধান্ত। সেটাও নেওয়া হয় ওই বয়সে বা ওর চেয়ে একটু বেশী বয়সে।

এমনো হতে পারত যে আমি প্রেমে পড়লেও অপর পক্ষ আমার প্রেমে পড়ত না, কিংবা দু'পক্ষে প্রেম থাকলেও বিবাহের পথে অলঙ্ঘ্য অন্তরায় থাকত। সুতরাং তৃতীয় সিদ্ধান্তটা একটা একপাক্ষিক সিদ্ধান্ত নয়, যেমন প্রথমটা বা দ্বিতীয়টা। বিবাহ হোক আর নাই হোক নন্‌কনফরমিস্ট আমি হতুমই। আর ফ্রী-লান্সও হতে পারতুম, যদি দেশটা হতো আমেরিকা, ভাষাটা হতো ইংরেজী আর বনিতা হতেন ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়-জায়ার মতো শিক্ষিকা। ম্যাট্রিকুলেশনের পর আমেরিকা প্রস্থানই ছিল আমার আদি পরিকল্পনা। আমেরিকায় যাব, জার্নালিস্ট হব, প্রেমে পড়ে সেদেশের কন্যাই বিবাহ করব, এই পরিকল্পনার প্রথম অংশটা আজো সফল হলো না, দ্বিতীয়টা আমি স্বেচ্ছায় পরিহার করেছি, আশ্চর্যের বিষয় প্রজাপতির নির্বন্ধে তৃতীয়টাই ফলে গেছে।

এখন বলি আমার নন্‌কনফরমিজমের কথা। এটাই আমার আদি সংকল্প ও এখনো এর থেকে আমি বিচ্যুত হইনি। ইনটারমিডিয়েট পরীক্ষা যখন দিই তার আগে একটা ফর্ম পূরণ করতে হয়। ধর্মের ঘরে আমি লিখি 'Eclectic monotheistic Hindu', সেই ১৯২৩ সালে যা লিখেছিলুম আজ ১৯৭৬ সালেও সেটার প্রত্যেকটি কথাই সত্য। আমি হিন্দু অথচ ব্রাহ্মদের মতোই একেশ্বরবাদী। বলতে গেলে তাঁদেরই একজন। তবে আনুষ্ঠানিক-ভাবে নয়। প্রথম বিশেষণটি আমাকে ব্রাহ্মদের চেয়েও স্বাধীন করেছে। আমার প্রার্থনার ভাষার কতক অংশ উপনিষদ্ থেকে নেওয়া, কতক বাইবেল থেকে। বৌদ্ধরা প্রার্থনা করেন না। ঈশ্বরবাদীও নন। তা বলে যে আমি বৌদ্ধদের কাছ থেকে কিছু নিইনি তা নয়।

আমার ধর্মবিশ্বাস বৌদ্ধদের মতো না হলেও নীতিসূত্র তাঁদের সঙ্গেই মেলে বেশী। তা ছাড়া বৈষ্ণব সাধনার সঙ্গে আমার একটা পৈত্রিক যোগসূত্র রয়েছে। সে সাধনা প্রেমের সাধনা। "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।" বৈষ্ণব কবিদের মতো আমারও বাণী এই।

সমাজেও আমি নন্‌কনফরমিস্ট। জাতপাত মানিনে। বাবার কাছেই আমার শিক্ষা। কায়স্থরা যখন পৈতে নিতে শুরু করে উনি বলেন, "না। ওতে আমাদের লাভের চেয়ে অলাভই বেশী।" একই সময় গান্ধীজীও পৈতে নেননি। উনি কমনার থাকতে চেয়েছিলেন, লর্ড হতে চাননি। আমরাও তাই। যে যুগের লর্ডের ছেলেরা লর্ড পদবী ছেড়ে মিস্টার হচ্ছে সে যুগে উপবীত একটা উপসর্গ। এ দেশে জাত অনুসারে পদবী হয় বলে অনেকে পদবী পর্যন্ত বর্জন করেছেন। শেষবয়সে রবীন্দ্রনাথও 'ঠাকুর' লিখতেন না। আমি কিন্তু অতদূর যাইনি, যেতে রাজী নই। বংশের একটা ধারাবাহিকতা আছে। সেটা রক্ষা করে পদবী। বংশ সম্বন্ধে এখনো আমার একটা মোহ আছে। মুসলমানরা যেমন জাত না মানলেও বংশ মানে। ওরে বাবা! সৈয়দের ছেলের নামের পূর্বে যদি সৈয়দ না লেখো তবে তুমি ক্ষমার অযোগ্য। আমার আরো একটি দুর্বলতা আছে। সাহেবরা যখন ছিল তখন একবার কি দু'বার খামের উপরে "বাবু" লেখা আছে দেখে সে চিঠি বা নিমন্ত্রণ আমি ঘুরিয়ে দিয়েছি। পরে আবার সেটা সংশোধিত হয়ে এসেছে। বরাবরই আমি "মিস্টার"। উপাধি চাইনি, পাইনি, ওই জাতীয় সম্মান সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছি। আমার হাত দিয়ে "ডক্টর" হয়েছেন কে জানে কতজন। আমি কিন্তু "ডক্টর" হতে চাইনি, হইনি ও হব না। আমি মনে করিনে যে রবীন্দ্রনাথকে ডক্টর টেগোর বললে ওঁর মহিমা বাড়ে।

রাজনীতিতে আমি আজীবন নন্‌কনফরমিস্ট। গান্ধীজীকেও যে সব সময় সমর্থন করেছি তা নয়। জবাহরলালজীকেও না। তবে এঁদের সঙ্গেই ছিল আমার সহমর্মিতা। আমি ভাগ্যবান যে এঁদের সংস্পর্শে এসেছি। কখনো কখনো এঁদের সমালোচনা করেছি। গান্ধীবাদী বা গান্ধীপন্থী কোনোটাই আমি নই। তবে তাঁর প্রিয় কর্ম আমারও প্রিয় কর্ম। তাঁর মৈত্রীভাবনা আমারও ভাবনা।

লেখক হওয়ার ইতিকথা

ছেলেবেলায় চোখে পড়ত আমাদের বাড়ির অদূরে ভিন্ন রাস্তায় ছোট একটি একতলা দালান। ওটা নাকি এককালে ছিল ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মরা একে একে প্রস্থান করেন, একজনমাত্র ব্রাহ্মকে আমি দেখি। তিনি উপাসনা করতে যান না। দালানটা খালি পড়ে থাকে। সেইখানেই আমাদের স্থানীয় অ্যামেচার থিয়েটার দল একবার 'ধ্রুব' অভিনয় করেন। কোথা থেকে একটি খর্ব ক্ষীণ শিশুকে কুড়িয়ে এনে ধ্রুব সাজানো হয়। তার অভিনয় এমন মর্মস্পর্শী হয় যে দুর্গাচরণ পট্টনায়ক সেই থেকে একটি বিখ্যাত অভিনেতা। 'নিমাইসন্ন্যাসে'ও তাকে বালকের ভূমিকায় নামানো হয়। বালকের পিতা তাকে নিমাইপণ্ডিতের পাঠশালা থেকে জোর করে টেনে নিয়ে যান। "ওহে নিমাইপণ্ডিত, ওহে বালকচোর" বলে ইয়া মোটা লাঠি হাতে যে ব্রাহ্মণটি রাজবাড়ির রংমহলে নামেন তিনি আর কেউ নন, আমার বাবা।

ও কি চিরকাল অভিনয় করে বেড়াবে নাকি? লেখাপড়া শিখবে না? ওকে আমার এক কাকা হাইস্কুলে ভর্তি করে দেন। পরের বছর আমি যখন ভর্তি হই তখন দুর্গার উপরেই আমার ঠাকুরমা ভার দেন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার ও টিফিনের সময় টিফিন খাওয়াবার। বলা বাহুল্য ওতে ওরও একটা ভাগ থাকত। এমনি করে যে বন্ধুতার সূত্রপাত হয় সে বন্ধুতা কলেজ জীবনেও অক্ষুণ্ণ থাকে। আর ওই দুর্গাই হয় আমার দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। হস্টেলে আমাদের মেসের ম্যানেজার হয়ে ও আমাকে ভাবনাচিন্তা থেকে মুক্তি দেয়। আমিও সেই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করি।

আমাদের স্কুলে একটি ছাত্রসমিতি ছিল। সেখানে বক্তৃতায় নাম করে দুর্গা। আমিও একটু আধটু মুখ খুলি। ছাত্রসমিতির কর্মকর্তাদের উপর রাগ করে দুর্গা একদিন এক সমান্তরাল ছাত্রসমিতি পত্তন করে। আমাকেও তাতে টানে। আমার কিন্তু তেমন উৎসাহ ছিল না। কারণ স্কুলের ছাত্রসমিতির একটি ম্যাগাজিন সেকশন ছিল। হেডমাস্টার মশায়ের আগ্রহে আমিই তার আলমারির চাবি রাখি ও যখন ইচ্ছা ক্লাস কামাই করে তখনকার দিনের নামকরা বাংলা ইংরেজী পত্রিকা গোগ্রাসে গিলি। এর মতো সুযোগ তো সমান্তরাল ছাত্রসমিতির ম্যাগাজিন সেকশনে পাব না। কোথায় পাব বিনা পয়সায় 'ভারতী', 'সবুজপত্র', 'মানসী ও মর্মবাণী' ইত্যাদি পত্রিকা। আর ডিবেটও তেমন জমে না। কিছুদিন পরে দুর্গার ওই সমিতি উঠে যায়। কিন্তু বোঝা গেল সংগঠনশক্তি ওর ছিল, আমার ছিল না। ও কর্মী, আমি ভাবুক। দুর্গা পরে মুটিয়েছিল।

সেই যে ব্রাহ্মসমাজের দালান সেটা রাজসরকারের সম্পত্তি। পরে সেখানে স্থাপিত হয় সংস্কৃত টোল। হয়তো স্থাপিত নয়, স্থানান্তরিত। আমার সম্বন্ধ টোলের সঙ্গে নয়, টোলের একটি ঘরে যিনি বাস করতেন তাঁর সঙ্গে। তাঁর নাম কেশবচন্দ্র কর। তাঁর সংস্কৃত বিদ্যা কতদূর তা জানতুম না, কিন্তু আমার প্রাইভেট টিউটর হয়ে তিনি আমাকে পড়াতেন ইংরেজী ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়। একদিন তিনি আমাকে পড়তে দেন কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'Epiphany' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক। অক্সফোর্ড মিশনের পাদ্রীদের দ্বারা পরিচালিত সেই পত্রিকাটি এই টোলের পণ্ডিতের কাছে নিয়মিত আসত। তিনি ছিলেন তার গ্রাহক। বার্ষিক চাঁদা মাত্র চার আনা। তিনি বলেন, "তুমিও গ্রাহক হয়ে পড়ো। দেখবে শেষপৃষ্ঠার এক কোণে তোমার নামও ছাপা হবে।" সত্যি তাই হলো। তারপরে দেখি সম্পাদককে যারা দুটি একটি প্রশ্ন পাঠিয়েছে তাদের নামও ছাপা হয়েছে, প্রশ্নের

সঙ্গে উত্তরও হয়েছে মুদ্রিত। এ তো বড়ো রঙ্গ! তা হলে আমিও কি প্রশ্ন করতে পারি? করলে আমার প্রশ্ন আর আমার নামও কি মুদ্রিত হবে? কেশববাবু বলেন, "হতে পারে, কিন্তু তা হলে তোমাকে ইংরেজী বাইবেল পড়ে প্রশ্ন নির্বাচন করতে হবে।"

ইংরেজী বাইবেল আমাদের বাড়িতেই ছিল। ছোটকাকা বাইবেল সোসাইটি থেকে উপহার পেয়েছিলেন। শুধু জানালেই হতো যে আমি এ বছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করেছি। বাইবেল নিয়ে বসে যাই। যীশুখ্রীস্টের বচন থেকে প্রশ্নও প্রস্তুত করি। তারপর পাঠিয়ে দিই সম্পাদকের নামে। অবাক কাণ্ড! আমার নামধাম ছাপা হয়েছে প্রশ্নসমেত। উত্তরসমেত। কেশববাবু বিশ্বাস করতে পারেন না যে ওসব প্রশ্ন আমার মাথায় এসেছে। "আপনারা তো বলেন ঈশ্বর নিরাকার। কেউ তাঁকে চাক্ষুষ করতে পারে না। তা হলে যীশু কেমন করে বললেন যে অন্তর যাদের পবিত্র তারাই ধন্য, তারাই ভগবানকে দর্শন করতে পারে।"

'এপিফ্যানী'তে প্রকাশিত সেই প্রশ্নই আমার প্রথম প্রকাশিত রচনা। যদিও সংক্ষিপ্ত ও পরভাষায় রচিত। এর পরে আমার সাহস বেড়ে যায়। কয়েকবার প্রশ্ন পাঠানোর পর কী যেন লিখে পাঠাই। তাতে সদ্য শিং গজানো বাছুরের মতো ঢুঁ মারতে আরম্ভ করি। সদ্য শেখা একটি ইংরেজী ইডিয়াম প্রয়োগ করি ইংরেজেরই উপরে। লিখি, "Christians are fools of the first water!" সাহেব যে সেটা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে না দিয়ে পত্রিকায় প্রকাশ করলেন এটা তাঁর খ্রীস্টীয় আচরণের দৃষ্টান্ত। কিন্তু সম্পাদকীয় স্তম্ভে সবিস্তারে খণ্ডনও করলেন। আর মন্তব্য করলেন খোঁচা দিয়ে, "Mr Annada Sankar Ray pays his intelligence a poor compliment by calling the Christians fools of the first water." আমার তো মুখ চুন। এর পরে আর ওঁদের

কাগজে লিখি কোন্ মুখে! ভালো বলতে হবে যে ওঁরা আমাকে মিস্টার বলেছেন। ভেবেছেন আমি একজন প্রাপ্তবয়স্ক ভদ্রলোক। যদিও বয়স আমার তখন তেরো কি চৌদ্দ।

কেশববাবু চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যান। কিন্তু সেই যে তিনি আমাকে একটা নেশা ধরিয়ে দিয়ে গেলেন সে নেশা আজ অবধি মিটল না। নামের নেশা আর লেখার নেশা। লিখে নাম করার নেশা। কেটে গেছে প্রায় ষাট বছর, কেশববাবুর আর কোনো খবর পাইনি। আমার জীবনে তিনি এসেছিলেন নিমিত্ত হয়ে। তিনি না এলে আমার লেখক হওয়া সেই বয়সে ঘটে উঠত না। বছর দুই বাদে আমি তখনকার দিনের বিখ্যাত ওড়িয়া সাপ্তাহিক 'উৎকল-দীপিকা'য় দয়ানিধি দাস ছদ্মনামে একখানা চিঠি লিখে নিজের ওড়িয়া রচনা ছাপার অক্ষরে দেখি, কিন্তু নিজের নাম নয়। তা যদি করতুম তা হলে মুশকিলে পড়তুম। কারণ, চিঠিখানার বিষয় ছিল সার্কাস পার্টি কর্তৃক দরিদ্র দর্শকদের অর্থশোষণ আর তাতে আমার এক সহপাঠীর মাতব্বরি। সহপাঠী তো অবাক। সবাইকে সুধায়, "দয়ানিধি দাস কে! কই, নাম তো শুনিনি।" আমি চুপ করে থাকি। সত্য বলার সাহস নেই। মিথ্যা বলার চেয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়। সার্কাস সত্যি সত্যি উঠে যায়।

এর পর আমার নাম বেরোয় বাংলায়। তখনকার দিনের সেরা পত্রিকা 'প্রবাসী'তে। তখন আমার বয়স সবে ষোল বছর পূর্ণ হয়েছে। এর পেছনে একটা অঘটন ছিল। থার্ড ক্লাস থেকে থার্ড হয়ে প্রমোশন পেয়ে আমি ঢেঙ্কানাল ছেড়ে পুরী চলে যাই। সেখানকার স্কুল যদিও সব দিক দিয়ে ভালো তবু মা বাবার জন্যে আমার প্রাণ কাঁদে। আমার জন্যে তাঁদেরও। তাই মাস ছয়েক বাদে ফিরে আসি ও পুরোনো স্কুলে আবার ভর্তি হই। থার্ড ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষার খাতাগুলো ছাত্রদের ফেরত দেওয়া হলে আমি আমার পাওয়া

নম্বরগুলো যোগ করে দেখি যে তু'নম্বর জুড়তে ভুলে যাওয়া হয়েছে। একছুটে হেডমাস্টার মশায়ের বাড়ি গিয়ে বলি, "সার, এই দেখুন, এই তু'নম্বর জুড়ে দিলে আমি হই মোটের উপর সেকেণ্ড।" হেডমাস্টার মশায় সেটা মেনে নেন। ফলে আমার বরাতে জুটে যায় সেকেণ্ড প্রাইজ। তাতে ছিল টলস্টয়ের 'তেইশটি গল্প'। তারই একটি গল্প আমি বাংলায় তর্জমা করি ও তর্জমাটি 'প্রবাসী'তে ছাপতে দিই। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুন্দর হাতের লেখায় পোস্টকার্ড লিখে আমাকে জানান যে লেখাটি মনোনীত হয়েছে, অচিরে প্রকাশিত হবে। একদিন 'প্রবাসী' খুলে দেখি আমার নাম। টলস্টয়ের সঙ্গে সেই যে সংযোগ সেটাও আমার জীবনের একটা মোড় পরিবর্তন। সেই থেকে আমি একজন টলস্টয়পন্থী। যদিও মাঝে মাঝে তাঁর কাছ থেকে সরে গেছি।

'প্রবাসী'র সেই রচনা আমাকে আত্মবিশ্বাস যোগায়। তবে তখনো আমি জানতুম না যে আমি একদিন সাহিত্যের আসরে নামব। মনের গতি ছিল সাংবাদিকতার দিকে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার আদর্শ। ইতিমধ্যে আমি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আরো বেশী। আমাদের স্কুলের লাইব্রেরীতে তাঁর 'চয়নিকা' ছিল। সেটিই সর্বপ্রথমে আমার চোখে পড়ে ও হাতে আসে ও মন কেড়ে নেয়। আরো অনেক বই ছিল তাঁর, সেই লাইব্রেরীতে। বুঝি আর না বুঝি চেয়ে নিয়ে পড়ে ফেলি। তখন থেকেই আমি তাঁর একজন ভক্ত শিষ্য।

আমাদের ম্যাগাজিন সেকশনে যেসব পত্রিকা ছিল তাদের মধ্যে ছিল প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র'। আমিই বোধহয় ওর একমাত্র অনুরক্ত পাঠক। রবীন্দ্রনাথের লেখা তো পড়তুমই, পড়তুম প্রমথ চৌধুরী তথা বীরবলের লেখা। জানতুম না যে একই মানুষের তুই নাম। তু'জনকেই ভালো লাগত। মনে মনে মক্‌স করতুম তাঁদের

স্টাইল। 'সবুজপত্রে'র সঙ্গে সাযুজ্যের একটা বড়ো কারণ ছিল কথ্যভাষা, আর একটা তার আধুনিক পাশ্চাত্য দৃষ্টি বা আউটলুক। মনে মনে আমি 'সবুজপত্রে'র মণ্ডলীভুক্ত হই। যদিও লেখক হবার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি।

আবার সেই দালানটির প্রসঙ্গে ফিরে আসি। কেশববাবুর বিদায়ের পর আর ওখানে যাইনে। যাই যখন ঢেঙ্কানালের কৃতী সন্তান সারঙ্গধর দাস চোদ্দ বছর জাপান ও আমেরিকা প্রবাসের পর স্বদেশে ফেরেন। সেখানে তাঁকে সংবর্ধনা করা হয়। দুর্গা না কে যেন আমাকে বলে একটা গান লিখে দিতে। আমি লিখি রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে, কিন্তু ওড়িয়াতে। ওই গান দিয়ে সভার কাজ আরম্ভ হয়। সারঙ্গবাবুও ছিলেন আমার আদর্শ। আমেরিকায় গিয়ে তিনি কেমন করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাসন মাজেন, ঘর ঝাঁট দেন, দেয়ালে রং লাগান ও রোজগারের টাকায় কলেজে পড়াশুনা করেন সেসব কথা বলে আমার মনে আমেরিকার স্বপ্ন জাগিয়ে দেন। আমিও সেদেশে গিয়ে তেমনি করে কলেজে পড়াশুনা করব। আর সেইসঙ্গে করব সাংবাদিকতা, যে বিষয়ে আমি স্কুলের লাইব্রেরী থেকে 'সেলফ এডুকেটর' নিয়ে পাঠ করেছি।

সারঙ্গধর দাস ছিলেন ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির বন্ধু। প্রথমে তাঁরা জাপানে যান, তারপরে আমেরিকায়। সুরেশচন্দ্র বাদ। পরবর্তীকালে সাহিত্যিক হিসাবে সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আমিও পরবর্তীকালে জাপান যাই, কিন্তু আমেরিকা যাওয়া এ জীবনে হয়নি। গেলে আর যাই হোক সাহিত্য হতো না। হয়েছিল ধনগোপালের হাতে, কিন্তু ইংরেজীভাষায়, বাংলায় নয়। আমি কলেজে গিয়ে কলেজ ম্যাগাজিনে ইংরাজীতে লিখে সকলের নজরে আসি। একবার তো আমার এক ইংরেজীর অধ্যাপকের কবিতার বিরুদ্ধে পালটা কবিতা

লিখি। শচীন্দ্রলাল দাস বর্মা লিখেছেন, “An Anti-feminist Cry,” আমি লিখি, “A Feminist Counter-cry.” এই কবির লড়াই সেইখানেই থেমে যায়, দ্বিতীয়বার ঘটেনি।

কত সহজে আমি ইংরেজী পত্রিকায় ঠাঁই করে নিতে পারি সেটা দেখে আমার আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই। ইতিমধ্যে সেটা হারিয়ে ফেলেছিলুম কলকাতা গিয়ে সাংবাদিকতার শিক্ষানবিসির ব্যর্থ চেষ্টায়। ‘সার্ভ্যান্ট’ ও ‘বসুমতী’ পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় আমাকে হিতোপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু লিখতে দেননি। দিলে হয়তো আমি একজন সাংবাদিক হয়ে উঠতুম, কিন্তু শেষ বয়সে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে তাঁর নিজের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন আমার বেলাও তাই সত্য হতো। “লিখেছি তো অনেক, তবু সাহিত্যে আমার স্থান নেই। কারণ, সাহিত্যে আমার দান নেই।”

আসলে সাহিত্য ও সাংবাদিকতা তুই স্বতন্ত্র জগৎ। তুই জগতে বাস করে তুই হাতে লেখা যায়, লিখতে লিখতে লেখায় উৎকর্ষও আনা যায়, কিন্তু সে লেখা সাহিত্য হয়ে ওঠে না। কম বয়সে একথা আমার জানা ছিল না। বয়স বাড়তে বাড়তে জ্ঞানও বাড়ে। তেমনি এটাও আমার জানা ছিল না যে, সার্থক সাহিত্যের ভাষা তিনটে হতে পারে না, তুটো হতে পারে না, সার্থক সাহিত্যের ভাষা একটাই হয়। তা তুমি যেটা ইচ্ছা সেটা বেছে নিতে পারো। আমি সব দিক ভেবে তিনটের একটাকেই শেষপর্যন্ত বেছে নিই। কিন্তু তার আগে তিনটেতেই হাত দিই। আমার ওড়িয়া রচনা ‘উৎকলসাহিত্যে’র সম্পাদক বিশ্বনাথ কর মহাশয় সাদরে গ্রহণ করতেন। ‘সবুজদল’ বলে একটি মণ্ডলী আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে গড়ে ওঠে। ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে ‘সবুজযুগ’ বলে একটা অধ্যায় থাকে। তাতে আমারও উল্লেখ থাকে। তখনো আমি ‘পথে প্রবাসে’ লিখে বাংলায় গৃহপ্রবেশ করিনি। কিন্তু সেকালের রচনাও সাহিত্যসৃষ্টি।

সাংবাদিকতার চিন্তা আমার মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে আমি স্থির করেছিলুম ইনটারমিডিয়েটের পর আবার কলকাতায় যাব ও সাংবাদিক হব। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমস্থান ও মাসিক পঁচিশটাকা ছাত্রবৃত্তি আমার চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। পাটনায় গিয়ে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি-এ পড়ি। ইচ্ছা ছিল ইতিহাসে অনার্স নিয়ে সার যদুনাথ সরকারের কাছে পড়ার, কিন্তু তার জন্যে আরো বেশী খাটতে হতো, সাহিত্যচর্চার জন্যে আরো কম অবসর পেতুম। তা ছাড়া ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট তো সুনিশ্চিত। অপর পক্ষে ইতিহাসে ওটা অনিশ্চিত। পরবর্তীকালে দেখি আই-সি-এস পরীক্ষায় ইতিহাসই আমাকে জিতিয়ে দিয়েছে, ইংরেজী নয়। সার যদুনাথের কাছে ইতিহাস পড়লে হয়তো অনার্সে একই ফল হতো। যাই হোক, তাঁর কাছে ইতিহাসের একটা পেপার আমি পড়েছি। সেটা ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুগ। আমার অতি প্রিয় বিষয়।

'পথে প্রবাসে' যে লেখা হলো সেটা আই-সি-এস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে বিলেতযাত্রার দৌলতেই। আর সেটা যে সার্থক হলো তার পেছনে ছিল ইউরোপের ইতিহাস অধ্যয়নে সার যদুনাথের প্রেরণা। আই-সি-এসের জন্যে আমি ইউরোপের ইতিহাসের আরো কয়েকটি শতাব্দী উজিয়ে যাই। ইউরোপকে চিনতে হলে সেটা অপরিহার্য। বলতে গেলে আই-সি-এস পরীক্ষাই আমাকে 'পথে প্রবাসে' লেখার জন্যে তৈরি করে দিয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষায় সফল না হলে আমার ইউরোপযাত্রাও হতো না, 'পথে প্রবাসে' লেখাও হতো না। তা হলে দেখা যাচ্ছে একটি সুযোগ থেকে আসে আর একটি সুযোগ। এমনি করে সাংবাদিকতার সংকল্প চাপা পড়ে যায়।

তা বলে ওটা আমি একেবারে ত্যাগ করিনি। ইচ্ছা ছিল না সরকারী চাকরিতে পাঁচবছরের বেশী আয়ুক্ষয় করার। বিশেষত

আয়ু যখন আমার পরিমিত। আমার ধারণা ছিল আমিও আমার মায়ের মতো অল্পায়ু। আমাকে দীর্ঘায়ু হতে সাহায্য করেছেন যিনি তিনি আমার সহধর্মিণী। আমার জীবন একরাশ আকস্মিকতার পরম্পরা। তেমনি এক আকস্মিকতা আমার বিবাহ। বিবাহের পর সংসারের ভার বাড়ে। নিশ্চিত রাজকর্ম থেকে অনিশ্চিত সাংবাদিকতায় ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করি। বছর দশেক চাকরির পর ঝাঁপ দিতে দিতে দেওয়া হলো না। সাংবাদিকতার অভিপ্রায় পেছিয়ে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল। সব ভালো যার শেষ ভালো। চাকরির জাঁতাকল থেকে একুশবছর বাদে ছাড়া পেয়ে আমি সাহিত্যেই একনিষ্ঠ হই।

পাটনার পাট

দুই বন্ধুতে টেনিস খেলছি। প্রফুল্ল ত্রিপাঠী আর আমি। লক্ষ করিনি যে পাশের রাস্তা দিয়ে আমাদের স্কুলজীবনের হেড মাস্টার রাজেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয় যাচ্ছেন। তিনি হঠাৎ থেমে আমাকে ডাকেন। বলেন, "তুমি ভুল শুনেছ, অন্নদাশঙ্কর। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় তুমি সেকেণ্ড হওনি।"

আমার মুখ শুকিয়ে যায়। ইতিমধ্যে কতলোকে অভিনন্দন জানিয়েছে। কাকা নাকি পুরীতে ভোজ দিয়েছেন। কে যে রটিয়ে দেয় অমন বাজে গুজব।

মাস্টার মশায় আমার হাতে ধরিয়ে দেন 'বিহার অ্যাণ্ড ওরিশা গেজেট'। তারপর টিপে টিপে হাসেন। আমি তো হাঁ! উত্তেজনা দমন করে তাঁকে পথের মাঝখানে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করি। তিনি আমাকে তুলে নিয়ে বলেন, "তোমার বাবাকে দেখাতেই যাচ্ছিলুম। চল, তুমিও চল।"

"আপনার ছেলে ফার্স্ট হয়েছে, নিমাইবাবু।" তিনি বাবাকেও হকচকিয়ে দেন। "আমার প্রিয় ছাত্র। আমিও গর্বিত।"

তিনি ধরে নেন যে আমি কটক কলেজ থেকে পাস করেছি, কটক কলেজেই পড়ব। সেখানে তখন একটিমাত্র বিষয়ে অনার্স ছিল। ইংরেজীতে। তা হলে বাড়ির থেকে বেশী দূরে যেতে হয় না। ঢেঙ্কানাল আর কটক। কুড়ি বাইশ মাইল।

আমার নিজের এক নম্বর প্ল্যান ছিল ডিভিজনাল স্কলারশিপ পেলে কটক কলেজেই বি-এ অনার্স পড়া। দু'নম্বর প্ল্যান স্কলারশিপ না পেলে কলকাতা গিয়ে আবার খবরের কাগজের আপিসে আপিসে ঘোরা, সাংবাদিকতার শিক্ষানবিসি করা। সরকারী চাকরি

আমার লক্ষ্য নয়। আমি চাই স্বাধীনভাবে লিখতে। স্বাধীনভাবে বাঁচতে।

"কটক কলেজেই পড়ব, সার। পঁচিশ টাকা স্কলারশিপ পেলে জীবনের জন্যে তৈরি হতে আরো ছ'বছর সময় পাব।" আমি সাংবাদিকতার সংকল্প স্থগিত রাখি।

ডিভিজনাল স্কলারশিপ মানে বিশ টাকা। প্রভিন্সিয়াল স্কলারশিপ মানে পঁচিশ টাকা। বিশ প্রত্যাশা করে আমি পঁচিশ পাব, এ কি কম সৌভাগ্য! তা হলেও আমার মনে একটা দুর্ভাবনা ঢোকে। কে জানে পাটনা কলেজে যদি ইংরেজীতে আরো ভালো ছাত্র থাকে, যে আমাকে অনার্সে হারিয়ে দেবে। এর প্রতিকার পাটনায় গিয়ে সেই ছাত্রটির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া। দূর থেকে বোঝা যাবে না কার কতদূর দৌড়। কিন্তু পাটনা যে অনেক দূর। আমার ভয় করে একা যেতে।

এমন সময় আমার সহপাঠী শরৎ মুখুজ্যের চিঠি। ও হয়েছে সেকেণ্ড। লিখেছে, "তুমি কী ঠিক করলে, জানিনে। আমি কিন্তু পাটনা চললুম ইকনমিকস অনার্স পড়তে।"

শরৎ যখন যাচ্ছে তখন আমার আর ভয় কিসের? যাক, বাঁচা গেল যে শরৎ আমার প্রতিযোগী হবে না। সেও যদি কটকে পড়ত ও ইংরেজীতে অনার্স নিত তা হলে কে জানে সে-ই হয়তো পরের বার ফার্স্ট হতো।

ভেবে চিন্তে আমি স্থির করে ফেলি যে, পাটনা যখন যাচ্ছি তখন যার তার কাছে ইংরেজী কেন, স্বয়ং যদুনাথ সরকারের কাছে ইতিহাস পড়ব। পরে এই নিয়ে গৌরব করতে পারব যে আমি যদুনাথের শিষ্য। কটক কলেজে তিনি কিছুদিন ছিলেন, একদিন ইংরেজীর ক্লাসও নিয়েছিলেন। তাঁকে আমার ভালো লেগেছিল। আই-এ পরীক্ষার পর একদিন তাঁর বাসায় গিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

তিনি পরামর্শ দেন ছুটিতে খেলাধুলা করতে ও ভবিষ্যতের জন্যে বলসঞ্চয় করতে। তাঁর বয়সে তিনিও খেলাধুলা করতেন। কটকেও একদিন ফুটবল খেলার রেফারি হয়ে দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন।

যদুনাথের আকর্ষণেই পাটনায় যাওয়া। ইতিহাস নেওয়া। খোঁজ নিয়ে দেখি আমাকে ভর্তি করেছে আমার কথামতো ইতিহাসের অনার্সে। কিন্তু লাইব্রেরীতে গিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখি ইতিহাসের অনার্সের পাঠ্যপুস্তকগুলি সংখ্যায় যেমন বেশী ওজনে তেমনি ভারী। যদুনাথই একমাত্র অধ্যাপক নন। ইতিহাসে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া কি মুখের কথা? খাটতে খাটতে ভূত হয়ে যাব যে! আমার বিশ্বাস ওর চেয়ে কম ক্লেশেই আমি ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাস আদায় করতে পারব। ভাবনা শুধু এই। ফার্স্ট হতে পারব তো? সে ভাবনাও ঘুচল যখন আমার সম্ভবপর প্রতিদ্বন্দ্বী কৃপানাথ মিশ্রের সঙ্গে আলাপ হলো। মোটাসোটা স্ফূর্তিবাজ ছেলে। মিশুক আর আড্ডাবাজ। এক আঁচড়েই বুঝতে পারি যে ফার্স্ট ক্লাস ও পাবে না। আই-এ'তেও ফার্স্ট ডিভিজন পায়নি। তখন ওর সঙ্গে আমার অলিখিত একটা বোঝাপড়া হয়। আমরা পরস্পর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটব না। ও সব সময় পেছিয়ে থাকবে, আমি সব সময় এগিয়ে থাকব। আমরা দু'দিন বাদে বন্ধু হয়ে উঠি। একসঙ্গে ঘোরাফেরা করি। মওলানা মহম্মদ আলীকে ইনটারভিউ করতে যাই। ও আমাকে হিন্দীভাষী মহলে পরিচিত করিয়ে দেয়।

কৃপানাথরা মৈথিল ব্রাহ্মণ। মৈথিলী ভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার যতখানি মিল হিন্দীভাষার সঙ্গে ততখানি নয়। কৃপানাথ বাংলা জানত বাঙালীরই মতো। ওর বাড়ি ভাগলপুর। সেখানে ওর বাঙালী বন্ধু বিস্তর। পরবর্তীকালে যিনি 'বিচিত্রা' সম্পাদক হন সেই উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সে ছিল প্রিয়পাত্র। ওঁর পত্রিকায় 'অষ্টাবক্র' ছদ্মনামে বাংলাতেও কৃপানাথ লিখত। তবে ওর সাহিত্যের

বাহন ছিল হিন্দী। নাটক লিখে পরে ও বেশ নাম করে। হিন্দী টাইপরাইটার উদ্‌ভাবন ওর পরবর্তী জীবনের কীর্তি। হিন্দী আর ইংরেজী দুই ভাষার ডিবেটে ওর অসাধারণ দক্ষতা। একবার বেনারসে যায় সেখানকার হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী ডিবেট প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে। আমরা তো ভেবেছিলুম জয়ী হয়ে ফিরবে। বিষণ্ণ মুখে বলে, "আমার হিন্দী নাকি বিহারী হিন্দী। ওরা গ্রাহ্যই করে না।"

পাটনা কলেজের মিণ্টো হিন্দু হস্টেলে আমার ঠাঁই হয় না। শরতেরও না। সীটের জন্যে আমাদের দরখাস্ত বড্ড দেরিতে পৌঁছয়। কাছেই একটা মেস ছিল। বেশীর ভাগ আবাসিকই ওড়িশার। এম-এ কিংবা আইন পড়ছেন। ভালো বাসা পাইনে, কিন্তু ভালোবাসা পাই। হস্টেলে ভালোবাসা কোথায়? স্বাধীনতা কোথায়? 'প্রবাসকুটির' থেকে কলেজে যেতে আসতেই যা কষ্ট। একদফা যেতে হতো ভরা পেটে ছুটতে ছুটতে। খালি পেটে ফিরে এসে কিছু মুখে দিয়ে আবার ছুটতে হতো খেলার মাঠে হাজিরা দিতে। তার পর আবার ফিরে এসে আবার কলেজ ডিবেটিং সোসাইটি বা চাণক্য সোসাইটিতে যোগ দিতে। দ্বিতীয়টা অর্থনীতির ছাত্রদের। অর্থনীতিও ছিল আমার অন্যতম পাস সাবজেক্ট। পড়াতেন নামকরা ইংরেজ অধ্যাপক হ্যামিলটন ও সিন্ধী অধ্যাপক বাখেজা। আর ইতিহাস আমার অনার্স সাবজেক্ট না হলেও পাস সাবজেক্ট। পড়াতেন যদুনাথ সরকার আর যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার। এছাড়া ইতিহাসে অধ্যাপক ভাটে, মহারাষ্ট্রীয়, অর্থনীতিতে অধ্যাপক হর্ন, স্কটল্যাণ্ডদেশীয়। রাধাকৃষ্ণ ঝা'র কাছেও পড়েছি অর্থনীতি। ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন আরমার, জ্যোতিশ্চন্দ্র ব্যানার্জি, নারায়ণমোহন দে। আরমার স্কটল্যাণ্ডবাসী।

খেলার মাঠে না গিয়ে অনেক সময় যেতুম গঙ্গার ধারে, বেড়াতুম সদলবলে। কিংবা বিহারী ইয়ংমেনস এসোসিয়েশন হলে। দেশ-

বিদেশের পত্রিকা পড়তুম। সাংবাদিকতার মোহ তখনো মন থেকে মোছেনি। বি এ পরীক্ষার ফল খারাপ হলে তো কথাই নেই, ভালো হলেও সাংবাদিকতাই আমার মনোমতো জীবিকা। স্বাধীনভাবে লিখতে, স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারব। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে কলকাতায় যখন সাংবাদিকতা শিখতে যাই একজন আমাকে পরামর্শ দেন, এখন নয়, গ্রাজুয়েট হতে হবে আগে। মেনে নিইনি, তবে উড়িয়েও দিইনি।

সন্ধ্যার পরে আমরা মেস থেকে পালিয়ে বাঁকিপুর ময়দানে সিনেমা দেখতে যেতুম। বম্বের এলফিনস্টোন সিনেমা সেখানে বারোমাস আস্তানা গেড়ে থাকত। দেখাত সেকালের বিশ্ববিখ্যাত যত নীরব চিত্র। মাঝে মাঝে রেল স্টেশনে গিয়ে ট্রেন চলাচল লক্ষ করতুম। যাত্রীদের মধ্যে যদি কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তি থাকেন। সরোজিনী নাইডুর দর্শনলাভের জন্যে বন্ধুরা দানাপুর পর্যন্ত হানা দিয়েছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগ দিতে গান্ধীজী আসেন। আসেন আরো অনেকে। সকলের নাম মনে পড়ছে না। মোতিলাল নেহরু, মহম্মদ আলী, সরোজিনী নাইডু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে মনে আছে। আমি সেই অধিবেশনে প্রবেশ পাই ফোটোগ্রাফার সেজে। ততদিনে বোধহয় আমি মিণ্টো হিন্দু হস্টেলে জায়গা পেয়ে গেছি। আমার সঙ্গে শরৎ।

পাশাপাশি দুই হস্টেল। মিণ্টো হিন্দু আর মিণ্টো মহোমেডান। দুই সমান আয়তন। বড়লাট মিণ্টোর আমলে বোধ হয় হিন্দু আবাসিক ও মুসলিম আবাসিক সমসংখ্যক ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে হিন্দুসংখ্যা বেড়ে গেছে, মুসলিম সংখ্যা কমে গেছে। বি-এ পাস করার পর আমি যখন এম-এ ক্লাসে ভর্তি হই তখন আমাকে মহোমেডান হস্টেলে জায়গা দেওয়া হয়। আমার মতো আরো কয়েকজন হিন্দুকে। আহারাদি হিন্দু হস্টেলে। আর সব মহোমেডান হস্টেলে। কিন্তু

সেকথা যথাকালে। হিন্দু হস্টেলে আমরা আবাসিকরা আলাদা একটি 'বাবাজী' বহাল করে তারই হাতে খাই। রান্নাটা আমাদের রুচিমতো হয়। বিহারীদের রুচিমতো নয়। কিন্তু 'বাবাজী' আমাদের তার চৌকার কাছে ঘেঁষতে দেয় না। জাতে ব্রাহ্মণ হলেও না। আমরা মছলি খাই, এটা আমাদের ম্লেচ্ছতা। মছলি কিন্তু সে রাঁধত নিজেই। তার ছিল একটা লম্বা মোটা তেল চুকচুকে লাঠি। সেটাকে সে রোজ তেল মাখাত। "কেন" জানতে চাইলে বলত, "মুসলমান লোগোঁকা সাথ লড়েঙ্গে।" মহোমেডান হস্টেলে থাকলেও বাবুর্চিখানায় তো যাইনি। বাবুর্চিকেও ছোরা শানাতে দেখিনি।

তুই হস্টেলের সংলগ্ন জিমনেসিয়ামে ভোরবেলা গিয়ে ড্রিল করতে হতো আমাদের। সে এক যন্ত্রণা। আই-এ পরীক্ষায় প্রথম হবার মাশুল দিতে হয়েছিল অনিদ্রায়। সেই অবধি অনিদ্রা আমার শয্যাসঙ্গিনী। শেষরাত্রে যখন ঘুম আসে তখন ঘুম ভাঙিয়ে দেবার মতো নিষ্ঠুরতা আর কী আছে? বন্ধুরা ডেকে তোলে। নইলে জিমনেসিয়ামে গরহাজির হয়ে জরিমানা গুনতে হবে। জিমনেসিয়ামের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন স্নেহপ্রবণ মুসলমান। আমার অবস্থাটা তাঁকে বুঝিয়ে বলতেই তিনি আমাকে মাফ করেন। জিমনেসিয়াম কামাই করলেও আমি গঙ্গাস্নান নিয়মিত করতুম। আর তাতেই আমার অনিদ্রার প্রতিকার হতো। সন্তরণ ছিল আমার প্রিয় ব্যায়াম। কী নদীতে, কী সমুদ্রে, কী পুষ্করিণীতে। কিন্তু 'প্রবাসকুটিরে' থাকতে সেটা প্রাত্যহিক ছিল না। ছিল সাপ্তাহিক। হস্টেলে আসার পর থেকে দৈনিক হয়।

আমাদের সেই জিমনেসিয়ামেই একদিন এক সভা হয়। ভাষণ দেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। সেদিন তাঁর সহধর্মিণী লেডী অবলা বসুকেও দর্শন করি। আচার্যের একটি কথা এখনো মনে আছে। তিনি ভোকেশনাল এডুকেশনের উপর জোর দেন। নইলে বেকার

সমস্যার সমাধান হবে না। তার পরে কেটে গেছে চুয়ান্ন কি পঞ্চান্ন বছর। ইনি উনি তিনি সকলেই উপদেশ দিচ্ছেন, চাই ভোকেশনাল এডুকেশন। কিন্তু দিকে দিকে গজিয়ে উঠছে সেই গতানুগতিক স্কুল কলেজ। আমার আশঙ্কা ছিল যে আচার্যদেব হয়তো আমাকেই ফেলবেন ভোকেশনাল এডুকেশনের খাতে। গতর খাটাতে আমি নারাজ। তাই মহাত্মার কথায় চরকা কাটতে শুরু করলেও পরে অবহেলা করেছি। তবে বেশী দাম দিয়ে খদ্দর কিনতুম। কলেজশুদ্ধ সবাই জানত যার পরনে হলদে রঙের মোটা খাদির পাঞ্জাবি ও তার নিচে রক্তরাঙা মোটা খাদির গেঞ্জি সেই ছেলেটি কে। এর দরুন যেমন উপহাসের লক্ষ্য ছিলুম তেমনি বিশেষ খাতিরের পাত্র। বিহারী হিন্দু ছাত্রমহলে আমার পক্ষপাতীর অভাব ছিল না। একবার একটা প্রবন্ধ লিখে হিন্দীপ্রেমীদের কাছ থেকে যে পুরস্কার পাই সেটা আমারই আগ্রহে প্রেমচন্দের উপন্যাস। হিন্দী মাসিকপত্র আমি নিয়মিত পড়তুম। কিন্তু সহপাঠীদের সঙ্গে কথা বলতুম ইংরেজীতে। হিন্দীতে বলতে গেলে পাছে ভুল হয়ে যায়। তবে সাধারণের সঙ্গে টুটি ফুটি হিন্দী দিয়ে কাজ চালাতে হতো। আমার মুসলমান সহপাঠীদের উর্দু ছিল আমার সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। একদিন মওলানা শওকৎ আলীর বক্তৃতা শুনতে গিয়ে মনে হলো ইংরেজীও ওর চেয়ে সুগম।

অর্থনীতির ছাত্রদের একটা সমিতি ছিল যার নাম চাণক্য সোসাইটি, তেমনি ইতিহাসের ছাত্রদেরও ছিল হিস্টরিক্যাল সোসাইটি। একদিন আমরা এক্সকারসনে বেরিয়ে পড়ি। আমাদের অধিনায়ক আচার্য যদুনাথ সরকার। দলে আমরা হিন্দু মুসলমান বাঙালী বিহারী মিলে জনা পনেরো ষোল। সব চেয়ে সিনিয়র যিনি তাঁর নাম বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ। সবাই তাঁকে মানত। আমরা যাই পাটনা থেকে বেনারস, সেখান থেকে দিল্লী, সেখান থেকে আগ্রা, সেখান থেকে

একভাগ ফিরি লখ্‌নৌ হয়ে, আরেকভাগ অন্য পথে। আচার্য যদুনাথের সঙ্গ আমি একদণ্ডের জন্যেও ছাড়িনে, ফলে বঙ্কিমদার গাফিলতির জন্যে বকুনি খেতে হয় আমাকেই। দিল্লী স্টেশনে নেমেই তিনি আদেশ করেন, যে যার মাল নিজেই বইবে, কুলি করবে না। কিন্তু বঙ্কিমদার কাজ হলো সব মাল একত্র করে কুলির কাঁধে পিঠে বগলে হাতে ও মাথায় চাপানো। এক একজন কুলি যে কী পরিমাণ মোট বইতে পারে তার নমুনা দিল্লীর কুলি। সার কিন্তু হনহন করে এগিয়ে চলেছেন, আমিও তাঁর সঙ্গে তাল রাখছি। হঠাৎ পিছন ফিরে বলেন, "কই, মাল কোথায় ? আর সকলে কোথায় ?" আমি বঙ্কিমদার নাম করতেই তিনি রেগে যান। "আমি প্রত্যেককেই বলেছি যে যার মাল নিজে বইবে। এখন এই কুলি খরচা দেবে কে ? এটা একটা ফালতু খরচ।" এর পরে তিনি আমাদের হুকুম দেন পায়ে হেঁটে হোটেলে যেতে হবে। টাঙ্গা করা চলবে না। মাল বলতে ভারী-ভারী তোরঙ্গ বিছানাও বোঝায়। যদিও আমার নিজের বোঝা হালকা। পায়ে হেঁটে যাবার সময় কুলির সাহায্য না নিয়ে উপায় ছিল না। সার তাতে অখুশি। অমনি করে খরচ বেড়ে যাচ্ছে। বাজেটে কুলোবে না। আমরা অবশ্য আনুমানিক ব্যয়ের অংশ দিয়েছি। হোটেলে গিয়ে দু'খানা ঘর নিয়ে আসবাবপত্র সরিয়ে দেওয়া হয়। মেজেতে ফরাস পেতে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে শীতের রাত্রে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুই। যিনি ভবিষ্যতে নাইট হবেন ও যিনি হবেন আই-সি-এস তাঁরা এক বালিশে মাথা রেখে পাশাপাশি শোন।

হোটেলে খাওয়াদাওয়ার বিল যে যার পকেট থেকে দেন। যদুনাথ মেনু দেখে নিজের জন্যে অর্ডার দিতেন মাংস ও চাপাটি, বোধহয় আরো একটা পদ। তাঁর বিল মোট পনেরো আনার ঊর্ধ্বে উঠত না। আমাদের পক্ষে সেটাও সাধ্যাতীত। আমরা বেছে নিতুম এমন কয়েকটা পদ যার মোট খরচ আনা আষ্টেক। আমি তাঁর

টেবিলেই বসতুম ও মেনু দেখে অর্ডার দিতুম। এটাও একরকম হাতে খড়ি।

আগ্রায় আমাদের টাকায় টান পড়ে। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছাত্রদের বলেন খাওয়া-দাওয়া হালওয়াইয়ের দোকানে করতে। আমরা বাঙালী হিন্দু ও উর্দুভাষী মুসলমান ছাত্ররা দুপুরে খেতে যাই এক মুসলিম হোটেলে। তিনিও আমাদের সঙ্গে। সেখানে আমাদের যা খেতে দেয় তা গোমাংস নয়, কিন্তু বাটি বা প্লেট না থাকায় একই ডেকচিতে হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে তুলে নিয়ে খেতে হয়, যতবার ইচ্ছে ততবার। পৃথকভাবে নয়, বারোয়ারিভাবে। পরের উচ্ছিষ্ট খেতে আমার সংস্কারে বাধে। এক ডেকচির ইয়ার হতে পারিনে। রাতের ভোজনটা যতদূর মনে পড়ে আর হোটেলে নয়। কোনো এক ছাত্রাবাসে। তখন হিন্দু মুসলমান ঠাঁই ঠাঁই। যেমন পাটনায়।

বাঙালী হিন্দু ছাত্ররাও সংখ্যালঘু। বিহারী মুসলমান ছাত্ররাও সংখ্যালঘু। তাই তাদের দুই দলের মধ্যে একরকম মৈত্রী লক্ষ্য করা যেত। ভোট দেবার সময় বাঙালী হিন্দুরা ভোট দিত বিহারী মুসলমানকে আর বিহারী মুসলমানরা বাঙালী হিন্দুকে। ফলে বিহারী হিন্দুদের সঙ্গে বাঙালী হিন্দুদের আড়াআড়ি ছিল। বিহারে বাস করে বিহারীর সঙ্গে বিবাদ যেন জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ। বাঙালীদের ভিতরে একটা হামবড়া ভাব ছিল। যেন তাদেরই উপর বর্তেছে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের ভার। ওদিকে বিহারীদের ভিতরেও কাজ করছিল একটা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা। "বিহারীদের জন্যে বিহার।" কোন্‌টা যে কোন্‌টার চেয়ে বেশী প্রবল—সাম্প্রদায়িকতা না প্রাদেশিকতা—তা বোঝা ও বোঝানো শক্ত। কংগ্রেসীদের সঙ্গেও আমার মেলামেশা ছিল। সদাকৎ আশ্রমে গেছি। জেলফের্তা অসহযোগী ছাত্রদের সঙ্গে আমার আত্মার আত্মীয়তা। আমরা সর্বাগ্রে ভারতীয়, তার পরে বাঙালী বিহারী হিন্দু মুসলমান। গান্ধীজীর উপর আস্থা

আমাদের একসূত্রে বেঁধেছিল। মহাত্মার উপরে যেমন বিহারীদের আস্থা তেমনি বিহারীদের উপর মহাত্মার। বিহারের সঙ্গে গান্ধীজীর এ সম্পর্ক বুদ্ধ মহাবীরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিহার তো বুদ্ধ মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত অশোক ও গুপ্ত সম্রাটদের দেশ। বিহার আবার একদিন উঠবে, আমার এ বিশ্বাস আমার বন্ধুদের প্রেরণা দিত। রাজেন্দ্রপ্রসাদজীকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করতুম। তাঁর সান্নিধ্যে আসিনি। তাঁর পুত্র মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে আলাপ ছিল।

তখনকার দিনে বিহারীদের মধ্যে সর্বাধিক সুপ্রতিষ্ঠিত পুরুষ ছিলেন হিন্দুমুসলিম নির্বিশেষে সার আলী ইমাম, যিনি বড়লাটের শাসনপরিষদের এককালীন সদস্য, তাঁর ভাই হাসান ইমাম, যিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি, সচ্চিদানন্দ সিংহ, যিনি গভর্নরের শাসনপরিষদের সদস্য। সিন্‌হা সাহেবকে একদিন আমরা আমাদের চাণক্য সোসাইটিতে আমন্ত্রণ করি ও তাঁর ভাষণ শুনি। তাঁর লাইব্রেরীটি তিনি সাধারণকে দান করেছিলেন। সেখানে প্রায়ই যেতুম দেশবিদেশের আধুনিকতম গ্রন্থ পাঠ করতে। সার আলী ইমামকে দেখেছিলুম নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির পাটনা অধিবেশনে গান্ধীজীর সঙ্গে সৌজন্যের সাক্ষাৎ করতে। সিন্‌হা সাহেবের মতোই সাহেবী পোশাক, বোঝবার উপায় ছিল না হিন্দু কি মুসলমান। আমিও তো একধরনের গোঁড়া ছিলুম, খদ্দর না পরলে কাউকে জাতীয়তাবাদী বলে স্বীকার করতুম না। অথচ এঁরা কি কেউ কম জাতীয়তাবাদী ছিলেন? তাছাঁড়া কম বিহারদরদী? বিহার যে একটা স্বতন্ত্র প্রদেশ হলো সেটা যাঁদের ধ্যানের, ভাবনার ও সাধনার ফলে এঁরাই তাঁদের অগ্রগণ্য। সেদিন বাঙালীরা এঁদের ক্ষমা করেনি। আর বিহারীরা এঁদের মাথায় তুলে নেচেছে। কিন্তু গান্ধী চালিত অসহযোগ আন্দোলন এই সব অসহযোগীদের পশ্চাদ্‌গণ্য করে। আমি তো এঁদের কোনো জনসভায় উপস্থিত হতে দেখিনি।

লাটসাহেব ছিলেন সার হেনরি হুইলার। যাঁর নাম শুনে মওলানা মহম্মদ আলী রসিকতা করেন, "ম্যান অ্যাট দ্য হুইল"। হুইলারকে লোকে দূর থেকে ডরাত। আমি কিন্তু তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। শান্তশিষ্ট মানুষ। বিরাট বা বলিষ্ঠ নন। সার আশুতোষ মুখার্জি যেবার গভর্নমেণ্ট হাউসে ভাষণ দেন কলেজের ছাত্রদেরও যেতে বলা হয়েছিল। গভর্নর সভাপতি। আমরা তাঁর আশে পাশে। এর পরের বার যাই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে স্নাতক হিসাবে। গভর্নর আমাদের চ্যান্‌সেলার। তাঁর হাত থেকে নিই ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স ও প্রথম স্থান লাভের জন্যে গেইট গোল্‌ড মেডাল। সার এডওয়ার্ড গেইট ছিলেন বিহারের আদি গভর্নর। কনভোকেশন অভিভাষণে হুইলার সাহেব বলেন, "আমি নিজেই তো গ্রাজুয়েট নই। গ্রাজুয়েটদের আমি কী উপদেশ দিতে পারি!" যোগ্যতা যে গ্রাজুয়েট হওয়া না হওয়ার উপর নির্ভর করে না তিনিই তার মূর্তিমান দৃষ্টান্ত। তিনি যে সময় আই-সি-এস হন সে সময় বিলেতের প্রার্থীদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী একান্ত আবশ্যক ছিল না।

কাছাকাছি এসেছিলুম আরেকজন আই-সি-এসের। তিনি আমাদের কমিশনার বি সি সেন। বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন। হর্ন সাহেব একদিন সেন সাহেবকে নিয়ে আসেন মিণ্টো হিন্দু হস্টেল দেখাতে। আমাদের ডেকে বলেন, "তোমরা কাগজ কলম নিয়ে বসে যাও। দশ মিনিটের মধ্যে ইংরেজীতে একটা প্রবন্ধ লেখ। বিষয়টা সেন সাহেব নির্দেশ করবেন। যার প্রবন্ধ সর্বোত্তম হবে তাকে তিনি বিশ টাকা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত।" পুরস্কারটা আমারই বরাতে ছিল। আমি হর্ন সাহেবকে বলি, "টাকা নিয়ে আমি কী করব? আমাকে একসেট 'জন ক্রিস্টোফার' দিলে মনে থাকবে। রম্যা রলাঁর উপন্যাস।" অধ্যাপক হর্ন বইয়ের দোকানে খোঁজ নিয়ে জানতে পান পঁচিশ টাকা

দাম। সেন সাহেবকে লেখেন তিনি কি আরো পাঁচটাকা বাড়িয়ে দিতে পারবেন? সেন রাজী হয়ে যান। আমিও খুশি হয়ে যাই। রলাঁর সেই চার খণ্ডে প্রকাশিত দশ পর্বের উপন্যাস পাঠ না করলে পরবর্তীকালে আমি কি ছয় খণ্ডের উপন্যাস লিখতে সাহসী হতুম? যার নাম 'সত্যাসত্য?'

স্কলারশিপের টাকা বাঁচিয়ে বই কেনার বাতিক আমার ছিল। কিনতুম কমলা বুক ডিপোর পাটনা শাখা থেকে। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে মারী স্টেপস প্রণীত 'ম্যারেড লাভ' আমি কোনো একটা পুরস্কারের টাকায় কিনেছি বা কিনিয়েছি। দুঃসাহসের না নির্লজ্জতার নিদর্শন? টমসনের 'আউটলাইন অভ সায়েন্স' ছিল তেমনি এক পুরস্কারের টাকায় কেনা। আই-সি এস পরীক্ষার কাজে লাগে। আমার কনিষ্ঠ কৃপাসিন্ধু মিশ্র ওখানি চেয়ে নেয়। পরে সেও আই-সি-এসে সফল হয়। 'প্রবাসী'র গ্রাহক ছিলুম আমি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। 'মডার্ন রিভিউ'য়ের গ্রাহক হই আই-এ পড়ার জন্যে কটক কলেজে ভর্তি হয়ে আচমকা একটা স্কলারশিপ পেয়েই।

স্কলারশিপের টাকায় কুলোত না বলে বাড়ি থেকে গোটাদশেক টাকা নিতে হতো। জলখাবারটা আমি নিজের হাতেই বানিয়ে নিতুম। আমার একটা প্রাইমাস স্টোভ ছিল। ডিম সিদ্ধ, হালুয়া, পরিজ, এর বেশী জানতুম না। কনডেনসড মিল্ক ছিল আট আনা টিন। সে রামরাজত্ব এখন স্বপ্ন। তেমনি কোয়েকার ওটস ছিল সুলভ আর সস্তা। তবে আমার যা ক্রয়ক্ষমতা পরিজ আমার প্রতিদিনের খোরাক ছিল না। রাত্রে এক পেয়ালা কোকো কিংবা ওভালটিন আমার চাইই, নইলে ঘুম আসবে না। তাতেও কি আসত? রাত জেগে পড়াও বারণ। আলো জ্বলছে দেখলে জরিমানা।

পরব বিশুদ্ধ খাদি অথচ খাব সুইটজারল্যাণ্ডের দুধ, ওটস ও বিলেতের কোকো বা ওভালটিন, যার উপাদান আফ্রিকার গোল্ড

কোস্ট, এর মধ্যে স্ববিরোধ ছিল বইকি। কিন্তু কট্টর স্বদেশী হয়ে স্বাস্থ্য রক্ষা করা কি আরো কম খরচে হয়? সব চেয়ে পুষ্টিকর অথচ সব চেয়ে সস্তা হচ্ছে ছাতু। যতদূর মনে পড়ে আমাদের 'বাবাজী'র জলখাবার নয়। একবেলার খাবারই ছিল ছাতু। চাপাটি ও রাতের বেলা বানাত সকলের জন্যেই, নিজের জন্যেও। দিনের বেলা আমাদের জন্যে ভাত, ওর জন্যে আলাদা করে রান্নার অবসরও ছিল না, থাকলেও খরচে পোষাত না, তাই ছাতু খেয়েই ষণ্ডা হতো। ছাতু খেয়ে স্বদেশিয়ানা ও ব্যয়সঙ্কোচের পরীক্ষা আমিও করেছি, কিন্তু মুখে রুচলেও পেটে সয় না। আর একটা জিনিস ছিল, খেতেও খাসা, কিনতেও সস্তা, হালুইকরদের জিলিপি বা অমৃতি। 'প্রবাসকুটিরে' থাকতে প্রাণভরে খেতুম। কিন্তু ও জিনিস খেয়ে খেলার মাঠে ফুটবল খেলার জন্যে বল পাওয়া যায় না। খেলার পর পড়ার জন্যে এনার্জি থাকে না।

আমাদের বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন চতুরচন্দ্ কুমার জৈন। জৈনরা রাত্রে খান না। রাতের খাবারটা সন্ধ্যার আগেই সারেন। নিরামিষ ও সরল, অথচ পুষ্টিকর ও বলকারক। চতুরচন্দ্ বলিষ্ঠ পুরুষ। বাহুবলের জন্যে আমিষ নিষ্প্রয়োজন। চতুরচন্দ্ একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। ঘৃতপক্ব ফুলকো কচৌরি। স্বাদ আর গন্ধ মনে রাখবার মতো। অমনটি কিনতে পাওয়া যাবে না। কাকে দিয়ে পাক তা জিজ্ঞাসা করিনি। 'বাবাজী'দের কাউকে দিয়ে নয় নিশ্চয়। ওটা চতুরচন্দ্রের স্পেশাল। সেই খাদ্য খেয়ে তিনি কিন্তু পড়াশুনায় চতুর ছিলেন না। তার বেলা মেছো আর ভেতোদেরই জিৎ। যার জন্যে জিৎ তার জন্যে বদনাম। "বাঙালীদের প্রত্যেকের এতগুলো ছেলেপুলে কেন? মাছ ভাত খায় বলেই।"

বাঙালীর ছেলেরা খেলাধুলাতেও কম ওস্তাদ ছিল না। দৃষ্টান্ত আমার সহপাঠী ভোলানাথ মল্লিক, হীরেন্দ্রনাথ সেন, দীনেশচন্দ্র রায়,

রমণীকান্ত ঘোষ। মল্লিক তো ইণ্ডিয়ান পুলিশে স্থান পেয়ে উঠতে উঠতে এত উপরে ওঠেন যে স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দক্ষিণ হস্ত হন। চীনযুদ্ধের ইতিহাসে নেহরুর সঙ্গে মল্লিকের নামও যুক্ত। কাশ্মীরে গিয়ে হজরতের হৃত কেশ উদ্ধার করে তিনি শান্তি ফিরিয়ে আনেন। তখন তাঁকে পদ্মভূষণ দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরেও বাঙালী ছাত্রদের উর্ধ্বগতি দেখেছি। তবে আমি নিজে বেশীদিন ওখানে টিকতে পারিনি।

বি-এ পরীক্ষার ফল আমার আশানুরূপ হয়। তখন আবার সেই একই প্রশ্ন। কলকাতা গিয়ে সাংবাদিকতা করব? না ত্রিশ টাকা স্কলারশিপ নিয়ে এম-এ পড়ব? ইতিমধ্যে আরো একটি প্রশ্নের উদয় হয়েছিল। আই-সি-এস প্রতিযোগিতায় সফল হলে বিলেত গিয়ে দু'বছর শিক্ষানবিশি করা যায়। চেষ্টা করতে দোষ কী? অন্তত জানতে পারা যাবে সারা ভারতের ছাত্রমহলে আমার স্থান কত উচ্চে বা কত নিচে। পাটনা ফিরে যাবার আগেই আমি আই-সি-এসের কাগজপত্র আনিয়ে নিয়ে প্রাথমিক কাজগুলো শুরু করে দিই। তারপর পাটনায় বসে কলেজ লাইব্রেরী থেকে বইপত্র আনিয়ে নিয়ে পড়ি ও আরো পড়ার জন্যে সিন্‌হা লাইব্রেরীতে যাই। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আই-সি-এস্ হতে উৎসুক ছিলেন তিনজন কি চারজন। আমি তাঁদের কাছে বিষয়তালিকা, পাঠ্যসূচী, পুরাতন প্রশ্নপত্র, পূর্বতন প্রতিযোগিতার ফলাফল দেখে যথাসম্ভব ওয়াকিবহাল হই। মৌখিক পরীক্ষা সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারেন না। শঙ্কা থেকে যায়, কী জানি কী জিজ্ঞাসা করবে, কী উত্তর দেব! আমি মুখচোরা মানুষ, অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হিমশিম খাই, তাও কিনা ইংরেজদের সঙ্গে!

আমার জানা ছিল না কোন্ বিষয়টাতে কেমন নম্বর ওঠে। আগে থেকে জানা থাকলে বাংলা সাহিত্য নিতুম। তাহলে প্রথম

বারেই প্রথম তিনজনের একজন হয়ে ১৯২৬ সালেই বিলেত যাত্রা করতুম। সেবার মাত্র তিনজনকেই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নেওয়া হয়, দু'জনকে নেওয়া হয় মুসলিম সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে মনোনয়ন দিয়ে, একজনকে খ্রীস্টান তথা ট্রাইবাল সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে মনোনয়ন দিয়ে। আমার স্থান ছিল পঞ্চম। প্রশ্নপত্র উলটিয়ে দেখতে অবহেলা করার দরুন একটা প্রশ্নের উত্তর লিখতে ভুলে যাই। সজাগ থাকলে পোজিশনটা হয়তো চতুর্থ হতো। তবে মৌখিক পরীক্ষায় আমি আশাতীত সুফল হই। পরীক্ষকদের একজনের সঙ্গে তর্ক না করলে হয়তো আরো নম্বর উঠত। পাঁচজনের মধ্যে একজন ছিলেন হিন্দু, একজন মুসলমান, বাকী তিনজন ইংরেজ। তাঁদের একজন নাকি বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য।

ভুল করতে করতেই মানুষ শেখে। আমি এর পরের বার বাংলা সাহিত্য নিই। যে দুটো পেপারে নম্বর তেমন বেশী ওঠেনি সে দুটো বাদ দিই। তবে ইউরোপের ইতিহাসের চারটে পেপারের সব ক'টাই রাখি। সেই চারটে পেপার পরীক্ষায় আমাকে যত না সাহায্য করুক ইউরোপে গিয়ে সেদেশের মানুষকে চিনতে ও তাদের জীবনকে জানতে সাহায্য করেছিল অতিমাত্রায়।

ওটা প্রকারান্তরে 'পথে প্রবাসে' লেখার জন্যেও প্রস্তুতি। বাইশ বছর বয়সে আমার মন তৈরি ছিল না, চোখ তৈরি ছিল না, হাত তৈরি ছিল না, যদি কিছু লিখতুম তা সাংবাদিকতা হতো, সাহিত্য হতো না। ব্যর্থতাই যে সিদ্ধির সোপান আমার অভিজ্ঞতাই তার প্রমাণ। দ্বিতীয় বারের প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম স্থান অধিকার করব, আমার এই ভবিষ্যদ্বাণীও সত্য হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই অঙ্গীকারও করি যে আই-সি-এস থেকে আমি পদত্যাগ করব। ওটা আমার স্বধর্ম নয়। তখনো আমার বিশ্বাস ছিল যে সাংবাদিকতাই আমার স্বধর্ম। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার প্রস্তুতিটা চলছিল সাহিত্যের। আমার ধারণা

ছিল সাংবাদিক হয়েও সাহিত্যিক হওয়া যায়, একই তো ধর্ম। এ ধারণা দূর হয় বিলেত থেকে ফিরে বারো বছর ধরে 'সত্যাসত্য' লিখতে লিখতে। অথচ সাহিত্যকে জীবিকা করতে যাওয়াও বিড়ম্বনা।

এম-এ ক্লাসে হাজিরা দিয়ে গেলেও ক্লাসের পড়ায় আমার একটুও মনোযোগ ছিল না। জানতুম যে আমার এম-এ দেওয়া হবে না। আই-সি-এস প্রতিযোগিতায় বার বার ব্যর্থ হলেও না। এম-এ দিয়ে আমি করতুম কী? সরকারী চাকরি তো আই-সি-এসের মতো কোনটাই নয়। জাতও যাবে, পেটও ভরবে না। স্বাধীনতাও যাবে, উন্নতিও হবে না। প্রাইভেট চাকরির জন্যে তদ্বির তদারক আমাকে দিয়ে হতো না। কোথায় আমার মুরুব্বির জোর! তাছাড়া সাংবাদিকতাই আমার বেছে নেওয়া জীবিকা। তাতে বি-এ, এম-এ তুইই সমান। তাছাড়া আরো একটা কথা। আই-সি-এসের জন্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করার পর এম-এ'র জন্যে আমার শরীরে আর পদার্থ থাকত না। ফার্স্ট ক্লাস পেতুম না। কেউ মনে রাখত না যে আমি বি-এতে ফাস্ট ক্লাস। সবাই জানত যে আমি এম-এ'তে সেকেণ্ড কি থার্ড ক্লাস। সেই তো শেষ পরীক্ষা। পরে তো সে কলঙ্ক মুছে ফেলার সুযোগ জুটত না। কেউ কেউ কলঙ্কমোচনের জন্যে বিভিন্ন বিষয়ে এম-এ দিয়ে অবশেষে রাহুমুক্ত হয়েছেন। তার পরে নিয়েছেন অধ্যাপকবৃত্তি। অধ্যয়নে যেমন আমার নিবৃত্তি ছিল না তেমনি অধ্যাপনায় ছিল না প্রবৃত্তি। সেটাও হতো আমার পক্ষে পরধর্ম।

পাটনা কলেজে না পড়লে আমি এতগুলি সাহেব অধ্যাপকের সান্নিধ্যে আসতে পারতুম না। হর্ন আর হ্যামিলটন পড়াতেন অর্থনীতি। আরমার আর অক্‌টারহেলানি ইংরেজী। জ্যাকসন ছিলেন প্রিন্সিপাল। একদিন আমরা সবাই এরোপ্লেন দেখতে গিয়ে লক্ষ করি জ্যাকসনের একপায়ে কালো রঙের জুতো, আরেক পায়ে বাদামী রঙের। ভুলটা ধরিয়ে দিতে ভরসা পাইনে। দিলে তিনি

মাঠের মাঝখানে অপ্রস্তুতই হতেন। হ্যামিলটন আমাকে তাঁর সেমিনারের লাইব্রেরী থেকে ইচ্ছামতো বই বেছে নিতে দিতেন এই শর্তে যে বই পড়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে হবে। বারট্রাণ্ড রাসেল আমার প্রিয় লেখক। তাঁর বই তুলে নিতেই তিনি জানতে চান এত লোক থাকতে রাসেল কেন। আমি বলি তিনি একজন অ্যাডভান্সড থিঙ্কার। হ্যামিলটন বলেন, "অ্যাডভান্স কথাটার মানে কী? যে লোকটা গঙ্গানদীর গর্ভের দিকে এগিয়ে যায় সে ও তো অ্যাডভান্স করে। কিন্তু সাঁতার না জানলে সে লোকটা তলিয়ে যায়।"

আরমার একদিন আমাকে তাঁর সেমিনার ঘরে একলা পেয়ে বলেন, "আমাকে তুমি তোমার পিতার মতো মনে করবে। অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করবে যখন যা দরকার। আমি তোমার আই-সি-এসে সাহায্য করব।" কী করে তাঁকে বলি যে যেসব বিষয়ে পরীক্ষা দিচ্ছি তার থেকে ইংরেজীর পেপার বাদ দিয়েছি। ধন্যবাদ দিই। অক্টারলোনি লোকটি পাগলাটে। পড়াশুনার বাইরে তাঁর একমাত্র কাজ ছিল যতদূর জানি কিটব্যাগ পিঠে বেঁধে পদযাত্রা করা। একবার আমাদের ঠেস দিয়ে বলেন, "আমেরিকানরা আমাদের সঙ্গে থাকবে না বলে স্বাধীন হয়েছে। সুখী হয়েছে আশা করি।" অর্থাৎ হয়নি, হতে পারে না। তোমরাও কি সুখী হতে পারবে?

যতদূর মনে পড়ে হর্নকে বি-এ পরীক্ষার সাফল্য সংবাদ দিয়ে কী যেন লিখেছিলুম, তা পড়ে তিনি আমাকে অভিনন্দন জানান, কিন্তু আমার 'ইনটেলেকচুয়াল অ্যারোগ্যান্সে'র নিন্দা করেন। আমি লজ্জায় মরি। পরে আবার আই-সি-এসের সাফল্য সংবাদ দিয়ে চিঠি লিখি ও বিলেতে তাঁর চেনা জানা লোকের নামে পরিচয়পত্র প্রার্থনা করি। তিনি অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন লণ্ডনে পৌঁছেই তাঁর বোন মিসেস ব্লিজার্ডকে আমার ঠিকানা জানাতে, তিনি আমাকে ডেকে

আলাপ করবেন। সেই সঙ্গে একথাও লেখেন যে তিনি পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি সার বসন্তকুমার মল্লিককে আমার নাম বলেছেন, আমি যে জাহাজে যাব তিনিও সেই জাহাজে যাবেন, আমি যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। মিসেস ব্লিজার্ড আমাকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন, তারপর টেট গ্যালারি ঘুরে দেখিয়েছিলেন। আর সার বসন্ত আমাকে শুনিয়েছিলেন আই-সি-এস জীবনের গোড়ার দিককার কথা।

যারা বিলেত গিয়ে আরো পড়াশুনা করবার সুযোগ পাবে না তাদের জীবনে এঁদের মতো বিদেশী অধ্যাপকদের সংস্পর্শে আসাও একটা শিক্ষা। একটা স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। আজকাল তো ভারতের ভিন্ন রাজ্যের অধ্যাপকের সংসর্গলাভও দুর্লভ। ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিস বাথেজা, ভাটে, হরিচাঁদ শাস্ত্রী, বাওয়া কর্তার সিং প্রভৃতি অধ্যাপকদের পাটনায় ও কটকে এনে স্থানীয় ছাত্রসমাজকে প্রাদেশিক গণ্ডীর বাইরে তাকাতে শিখিয়েছিল। পাটনায় ও কটকে বাঙালী অধ্যাপকদের সান্নিধ্য বিহারী তথা ওড়িয়া ছাত্রদের পক্ষে আত্মোন্নয়নের সহায়ক হয়েছিল। সেসব দিন আর নেই। সেসব মানুষও আর নেই। আমি যে সার যদুনাথের পায়ের তলায় বসে বিদ্যালাভ করেছি এই সৌভাগ্যে আমি কৃতার্থ। সমাদ্দার মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের ছিল আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বাঙালী বিহারী নির্বিশেষে, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই তাঁর আলয়ে স্বাগত।

মহোমেডান হস্টেলে আমাকে একখানা একাসনী ঘর দেয়। তার দরজায় আমি কী লিখেছিলুম তা আমার নিজেরই স্মরণ ছিল না। প্রায় ত্রিশ বছর বাদে আমার স্ত্রী সতীনাথ ভাদুড়ীর বিখ্যাত উপন্যাস 'জাগরী' অনুবাদ করে তাঁর অনুমতি চাইলে তিনি সানন্দে অনুমতি দেন। সে সময় আমাকে মনে করিয়ে দেন যে আমার ঘরের দরজায় লেখা ছিল "Don't Quarrel With Facts." তিনি

দেখতে পান যখন আমার পরে আমার ঘর তাঁকে দেওয়া হয়। সতীনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। সেকালেও না, পরবর্তী কালেও না।

মহোমেডান হস্টেলে ভিন্নধর্মী ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ প্রতিদিন মেলে। বন্ধুতাও গড়ে ওঠে। ইংরেজী অনার্সের ছাত্র ফজলুর রহমান ছিল আমাদের বন্ধু গোষ্ঠীর একজন। সে গোষ্ঠীর আরো এক জন ভবানী ভট্টাচার্য। রাঁচীতে আই-সি-এসের ডাক্তারি পরীক্ষার জন্যে গিয়ে আমি ভবানীদের বাড়িতে অতিথি হই। ভবানী সাহিত্যিক হতে চায় শুনে তার বাবা প্রমথনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন, "ওকে বিয়ে করতে হবে, ঘরসংসার চালাতে হবে, সাহিত্য করে কী হবে?" তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে দেখতেন তাঁর ছেলে এখন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক, তার শিরে যশ ও অর্থ অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়েছে। রাশিয়া আর আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী আর ফ্রান্স কোথায় না তার সমাদর? অথচ পাটনায় সে ছিল নিতান্ত নিরীহ, লাজুক, নীরব প্রকৃতির দুবলা পাতলা ক্ষীণ-দৃষ্টি এক ছাত্র। ফজলুর রহমান কতকটা তাই। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল এক শয়তানের সঙ্গে আরেক শয়তানের। ইংরেজীতে শয়তানের যে এতগুলো নাম আছে তা আমিও জানতুম না। ও রোজ আমাকে একটা নতুন নামে ডাকত আর আমিও ডিক্সনারি ঘেঁটে তার পালটা দিতুম। "এই বীলজেবাব!" "এই লুসিফার!" ক'জনই বা জানত যে আমরা হাসিমুখে পরস্পরকে সম্ভাষণ করছি "এই শয়তান" বলে? শরতের বিয়েতে হাজারিবাগ গিয়ে ফজলুর আর আমি এক বিছানার শরিক হই। শীতের রাত। রেজাইখানা খাটো। একবার ও টেনে নিয়ে মুড়ি দেয়। একবার আমি। দু'জনেই পালা করে হিহি করে কাঁপি।

যেবার আমি পঞ্চম স্থান অধিকার করেও আই-সি-এস হতে

পারিনে সেবার আমাদেরই কলেজের সৈয়দ আমীন আহমদকে মনোনয়ন দেওয়া হয়, যদিও তাঁর স্থান পঞ্চবিংশ। যাক, আমাদেরি একজনকে যে নেওয়া হয়েছে এতেই আমি খুশি। তা বলে আমীন আহমদের বিদায় ভোজে আমাকেও নিমন্ত্রণ করা কেন? ওরা কি বোঝে না যে ওটা হচ্ছে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে? যে কনের বিয়ে হতে যাচ্ছিল আমার সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে আরেক জনের সঙ্গে। হলেই বা সেজন আমার বন্ধু। আমি কি বরযাত্রী হয়ে পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসতে পারি? কী করি! ভদ্রতার খাতিরে রাজী হই। কিন্তু মুসলমানদের ভোজ। কী জানি কী মাংস পরিবেশন করবে! মনে মনে বিষম শঙ্কা। মুখ ফুটে বলতে পারিনে যে, হাজার উদার হলেও আমি ওই মাংসটা খাইনে। তোমরাও তো খাও না আরেক প্রাণীর মাংস। যথাকালে ভোজের টেবিলে বসি, যাহা পাই তাহা খাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছুঁচো গেলার মতো ব্যাপার। তবে আমার বিশ্বাস ওরা আমাকে যা দিয়েছিল তা ও মাংস নয়। হিন্দু মুসলিম মৈত্রীর সাধকদের পক্ষে ওটাই হচ্ছে "অ্যাসিড টেস্ট।"

পরের বার আমিও তো প্রথম স্থান অধিকার করে হস্টেলের মুখ রাখি। কিন্তু আমাকে ভোজ দেবার অনেক আগেই আমি পাটনা ত্যাগ করেছি। তার পেছনেও ছিল এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। প্রতিযোগিতাটা আমার পক্ষে ছিল জীবনমরণ সমস্যা। পরের বারও যদি বিফল হই তো আমার ওপর যিনি নির্ভর করেছেন তিনি অকূলে ভাসবেন। তিনি এক বিপন্ন মহিলা, আমি তাঁর বন্ধু। আমাকে আরো জোরসে পড়তে হয়। একটা মিনিটও বাজে খরচ করিনে। রান্নাঘরে খেতে গিয়েও বই পড়ি। এম-এ ক্লাসে নিয়মিত হাজিরা দিতে হয়, সেখানেও লুকিয়ে লুকিয়ে আই-সি-এসের জন্যে পড়ি। ওটা কি অধ্যাপকের প্রতি অসৌজন্য নয়? নিশ্চয়ই অসৌজন্য। কিন্তু আমি তো তাঁকে ডিস্‌টার্ব করছিনে। পেছনের সারিতে বসি, মাথা নিচু

করে থাকি, মুখ বুজে সময় কাটাই। অধ্যাপকরা কি জানতেন না যে আমি আই-সি-এস পরীক্ষার্থী? সবাই ক্ষমাচক্ষে দেখতেন। কিন্তু একদিন আমার অশেষ শ্রদ্ধাভাজন ব্রাহ্ম অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী মহাশয় আমাকে উঠে দাঁড়াতে বলেন। "হাতে ওটা কী বই?" আমি নাম করি। "আমার ক্লাসে বসে ও বই পড়া চলবে না। ইচ্ছে করলে তুমি বেরিয়ে যেতে পারো।" আমি বিনা বাক্যে বেরিয়েই যাই। এর পরে আর আমি ওঁর ক্লাসে যাইনে। কারো ক্লাসেই না। আমার মাথার উপরে ঝুলছে পরীক্ষার খড়্গ। মাত্র দেড়মাস বাকী। এই সময়টা ঘরে বসে পড়লে আরো বেশী নম্বর তুলতে পারব। আর প্রতিযোগিতা তো নম্বরের খেলা। এদিকে যে এম-এ'র লেকচার শর্ট পড়বে। পরে কি এম-এ পরীক্ষা দিতে পারব? যদি আই-সি-এসে বিফল হই? আমি মনঃস্থির করি যে এম-এ পরীক্ষা দেবই না। যা থাকে কপালে।

আই-সি-এসের পালা চুকিয়ে দিয়ে এলাহাবাদ থেকে যখন ফিরে আসি তখন শুনি আমার স্কলারশিপ বন্ধ হয়েছে। কর্তারা বোধ হয় আশা করেছিলেন যে আমি তাঁদের হাতে পায়ে ধরে মাফ চাইব। আমি তল্পিতল্পা বেঁধে দেনাপাওনা মিটিয়ে এক্কার পিঠে চড়ে রেল-স্টেশনে যাই ও বোলপুরের টিকিট কাটি। বন্ধুরা সুধায়, "আই-সি-এস না হলে আবার ফিরে আসবে তো?" আমি বলি, "আই-সি-এস আমি হবই। যদি একজনও হয় তবে সেই জনটি এই জন।"

ভগবান আমার মানরক্ষা করেন। তখন আমিও কপিলদেও বাবাজীকে পাঠিয়ে দিই মোটা বকশিশ। সে আমাকে যত্ন করে খাইয়েছিল, যা সে আর কারো বেলা করেনি। অন্য সময় আমার বেলাও না। রোজ বলত, "এবার আপনি পাস করবেন।" অবশ্য ছাপরার হিন্দীতে। "বকশিশের কথা যেন খেয়াল থাকে, অন্দাবাবু।"

আমার বন্ধু কৃপানাথ আমার কাছে নব প্রকাশিত 'বিচিত্রা'র জন্যে

একটি লেখা চেয়ে পাঠায়। আমি পাঠাই 'রক্তকরবীর তিনজন'। সেটি পত্রস্থ করে সম্পাদক তাকে বলেন এই লেখকের আরো লেখা চাই। আমি তাকে লিখি, বেশ। বিলেত থেকে ভ্রমণকাহিনী পাঠাব। সম্পাদক রাজী হন। অমনি করে 'পথে প্রবাসে' শুরু। প্রথম কিস্তিটা পাঠাই বম্বে থেকে। তারপরে লণ্ডন থেকে।

পাটনাকে আমি ছাড়তে চাইলেও পাটনা কি আমাকে ছাড়তে চায়? কমলী নেহী ছোড়তী। লণ্ডনে একে একে হাজির হয় কৃপানাথ, ভবানী, ফজলুর রহমান, বলভদ্রপ্রসাদ, রমণীকান্ত ঘোষ, স্বর্ণলতা ঘোষ, কৃপাসিন্ধু মিশ্র। কটক থেকে হরিহর মিশ্র, নৃসিংহ মহান্তি। সৈয়দ আমীন আহমদ তো আগে থেকেই ছিলেন। এলেন আমাদের হস্টেল সুপারিণ্টেনডেণ্ট অধ্যাপক সৈয়দ আলী হাসান। এ কী! এ যে অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী সশরীরে উপস্থিত! নাটকের উপর থীসিস লিখে ডক্টরেট পেতে চান। কিন্তু তার জন্যে থাকতে হবে দুটি বছর। চেহারা দেখে মায়া হয়। কোথায় সেই রুদ্র রূপ! বিদেশে বিভুঁইয়ে আমরাই তো তাঁর ভরসা। বাড়ির জন্যে মন কেমন করে, বোধ হয় সংসারেও টান পড়ে। তিনি কিছুদিন পরে ফিরে যান।

বলেছি পাটনা থেকে বোলপুরের টিকিট কাটি। ফেব্রুআরি মাসে বাড়ি ফিরে গিয়ে করবার কিছু ছিল না। দিন গুনতে হতো কবে ফল বেরোবে। শান্তিনিকেতনের কর্তারা আমাকে পান্থশালায় থাকতে দেন। থাকি তিন সপ্তাহ। সে সময় যাঁদের সঙ্গে আলাপ হয় তাঁদের অন্যতম হলেন স্বনামধন্য প্রমথনাথ বিশী। কিন্তু তখনকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে বিশ্রাম করতে আসেন আই-সি-এস পরীক্ষায় আমার প্রতিযোগী নতুন আলাপী দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার। দ্বিজেন প্রথম চেষ্টাতেই সফল হন। আমি তাঁদের কলকাতার বাড়িতে অতিথি হয়ে বাড়ির ছেলের মতো

আদর পাই। বিলেতযাত্রার প্রস্তুতি আমরা একসঙ্গেই করি। একই ট্রেনে যাবার কথা ছিল, বন্যার জন্যে কটক থেকে কলকাতায় পৌঁছতে পারিনে। বম্বেতে একত্র হই। আমাদের বন্ধুতা সারাজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। মাস কয়েক আগে আমার প্রিয় বন্ধু আমাকে ফেলে স্বর্গে চলে গেছেন। তার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যান। তখনি তাঁর মুখে শুনি, "এই বোধ হয় শেষ দেখা।" আশ্বাস দিই যে আবার দেখা হবে। আমাদের বন্ধুতা অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করেছিল। আজ আমি ওঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

যা বলছিলুম। শান্তিনিকেতন থেকে পুরী। পুরীতে কাকার বাড়িতে বসেই কাগজে পড়ি যে ১৯২৭ সালে সফল যাঁরা হয়েছেন তাঁদের শীর্ষে আমি। ষষ্ঠ দ্বিজেন আর নবম হিরণ্ময়। বম্বেতে আমরা মিলিত হয়ে এক বিছানায় রাত কাটাই। পরের দিন এক জাহাজে যাত্রা করি।

বীর নায়ক

ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে এই ধারণা যে, কাব্য নাটক উপন্যাসের হীরো যারা হবে তারা বাস্তব জীবনেও হীরো হবে। বুড়ো বয়সেও এ ধারণা আমার মন থেকে নির্মূল হয়নি। এখনো আমার মতে কাব্য নাটক উপন্যাসের হীরো যারা তারা কায়িক অর্থে বীর না হোক মানসিক অর্থে বীর হবে, মানসিক অর্থে বীর না হোক, নৈতিক অর্থে হবে, নৈতিক অর্থে বীর না হোক রাজনৈতিক অর্থে হবে। আমি জানি প্রাচীন গ্রীসের বা প্রাচীন ভারতের বীরত্বের যুগ কবে নিঃশেষ হয়ে গেছে, মধ্যযুগের ইউরোপের তথা ভারতের বীরত্বের যুগও বহুকাল থেকে অবসিত। তাই রামায়ণ মহাভারতও আর হবে না, ইলিয়াড অডিসিও না, রাজা আর্থারের নাইট কাহিনী বা রাজস্থানের চারণ গাথাও আর না। তাহলে কি বীরদের সঙ্গে আর কোনো দিন আমাদের সাক্ষাৎ হবে না? জীবনেও না, সাহিত্যেও না? আমার মন এটা মেনে নিতে নারাজ। উপন্যাসে হাত দেবার আগে এখনো আমি বীর খুঁজে বেড়াই। নয়তো নায়ক হবে কে? আছে, আছে, ওরা অন্য নামে আছে।

আমার বুদ্ধিশুদ্ধি, আমার বস্তুজ্ঞান, আমার সাংসারিক অভিজ্ঞতা আমাকে বোঝায় যে, আইডিয়াল চরিত্র কোথাও নেই, কোথাও ছিল কি না সন্দেহ। কবি ও নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকরাই আইডিয়ালাইজ করেছেন। লোকে যেমনটি দেখতে ভালোবাসে। কিংবা কবি নাট্যকার ঔপন্যাসিকরা যেমনটি কল্পনা করতে ভালোবাসেন। নির্মোহ বাস্তববাদ আধুনিক যুগের পূর্বে লক্ষিত হয়নি। যতই দিন যাচ্ছে ততই সেটা প্রকট হচ্ছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপে যেটা নজরে এল সেটা শুধু প্রকট নয়, সেটা উৎকট। বীরপুরুষ বা

মহাপুরুষদের একে একে স্বরূপ প্রকাশ করা হচ্ছে। ইংরেজীতে যাকে বলে ডিবাঙ্ক করা। এটাও বাড়াবাড়ি। দোষেগুণে মানুষ। যার দোষগুলো উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তার গুণগুলো আগের মতো জ্বলজ্বল না করলেও একেবারে নিবে যায়নি। যার চোখ আছে সে-ই দেখতে পাবে।

টলস্টয়ের 'সমর ও শান্তি' পড়ে কে না মুগ্ধ হয়েছে? কিন্তু সেটাকে একালের এপিক বলে শিরোপা দেবার পর একদল সমালোচক প্রশ্ন করেন, "হোমারের মতো এপিক লেখা হয়েছে, কিন্তু ইলিয়াডের মতো বীরপুরুষরা কোথায়? টলস্টয়ের চরিত্ররা কি অনুরূপ উচ্চতার?" টলস্টয় এর উত্তরে যা বলেন তার মর্ম "দেশটা রাশিয়া আর যুগটা উনবিংশ শতাব্দী। একালে সেকালের ও এদেশে সেদেশের বীরপুরুষদের উচ্চতা কোথায় পাব?" কৈফিয়ৎটা কেবল টলস্টয়ের নয়, সমসাময়িক সাহিত্যিকদের সকলের। এতে যদি কারো মন না ভরে তিনি আধুনিক সাহিত্য না পড়ে প্রাচীন সাহিত্য পড়বেন। কিন্তু হুবহু সেই রকমটি আর হবার নয়। যদি না সত্যযুগ ফিরে আসে। অথবা আবার আসে মহাভারতের বা রামায়ণের যুগ।

মহাভারতের নায়ক কে, একবার আমাকে এই প্রশ্নের উত্তরে লিখতে হয়েছিল—যুধিষ্ঠির। কারণ তিনিই একমাত্র মানুষ যিনি সশরীরে স্বর্গে যেতে পেরেছিলেন, অথচ তাঁকে একদিনের জন্যে নরক দর্শন করতে হয়েছিল, যেহেতু তিনি একবার একটি অর্ধসত্য উচ্চারণ করেছিলেন। "অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ। যার প্রথম অংশটি শুনে দ্রোণাচার্যের প্রাণবিয়োগ হয়। যুধিষ্ঠির যে জুয়াড়ী ছিলেন, জুয়াখেলায় স্ত্রীকে পর্যন্ত বিকিয়ে দিয়েছিলেন এর জন্যে মহাভারতকার তাঁকে শাস্তি দিলেন না। দিলেন যার জন্যে সে অপরাধ অমার্জনীয়। মহাভারতে সত্যেরই জয়। সত্যই ধর্ম। তাই ধর্মের জয়। যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র। এমন যে যুধিষ্ঠির তিনি অর্জুনের মতো বীরপুরুষ ছিলেন না

বলে তাঁর বীরত্বের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন প্রথমে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বুদ্ধদেব বসু। তবে কি অর্জুনই মহাভারতের নায়ক ? যুধিষ্ঠির নায়ক নন ? অর্জুনের বীরত্ব শুধু ভারতবিখ্যাত নয়, ইন্দোনেশিয়ায় বিস্তৃত। সেদেশের মুক্তিদাতা সুকর্ণ ছিলেন পরম অর্জুনভক্ত। তাঁর ঘরে দেখা গেছে অর্জুনের ছবি। যদিও তাঁর ধর্মে ছবি রাখা নিষেধ। তিনি ধর্মে মুসলমান। সংস্কৃতিতে ভারতীয়। তাঁর নামই তার প্রমাণ। সুকর্ণ মানে সু-উপসর্গযুক্ত কর্ণ। কর্ণ এখানে কান নয়, মহাভারতের অন্যতম বীর কর্ণ। শান্তিনিকেতনে ইন্দোনেশিয়ার এক অধ্যাপক এসেছিলেন তাঁর নাম বীর্য সুপার্থ। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বলেন, বীর অর্জুন। বীর্য মানে এখানে বীর। আর সুপার্থ মানে সু-উপসর্গযুক্ত পার্থ। অর্জুনকে আমি খাটো করতে চাইনে, লোকচক্ষে তিনিই বীরোত্তম, যুধিষ্ঠির তা নন, কিন্তু সশরীরে স্বর্গে প্রবেশ করার গৌরব তাঁরও হলো না। যুধিষ্ঠির গিয়ে দেখেন অর্জুনও আর সকলের মতো নরকে, সেখান থেকে পরে স্বর্গে যাবেন। মহাভারতের যুগের মূল্যবোধ সত্যপরায়ণতাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছিল, বীরত্বকে নয়। সেইজন্যে আমি যুধিষ্ঠিরকেই নায়কের আসনে বসিয়েছিলুম।

আমার সেই লেখা পড়ে আপত্তি করেন আমার বন্ধু দিলীপকুমার রায়। তাঁর মতে মহাভারতের নায়ক কৃষ্ণ। ওটা ভক্তিসিদ্ধ হতে পারে, যুক্তিসিদ্ধ নয়। মহাভারতের মূল আখ্যান ভরতবংশীয় কৌরব পাণ্ডবদের ভ্রাতৃবিরোধ। নায়ক যদি কেউ থাকেন তো তিনি তাঁদেরি একজন। কৃষ্ণের ভূমিকা অবশ্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে পক্ষে নারায়ণ সেই পক্ষে জয়। মহাকাব্যে নায়ক যিনি তাঁর একজন প্রতিনায়কও থাকেন। যুধিষ্ঠির নায়ক হলে তিনি দুর্যোধন। কৃষ্ণ নায়ক হলে তিনি কে ? শিশুপাল ? জরাসন্ধ ? মেনে নেওয়া শক্ত। নায়ক থাকলে একজন নায়িকাও থাকেন। যুধিষ্ঠির বা অর্জুন নায়ক হলে

তিনি দ্রৌপদী। কৃষ্ণ নায়ক হলে তিনি কে? রুক্মিণী? মেনে নিতে পারিনে। রাধাকেই এতকাল তাঁর নায়িকা বলে জেনেছি। কিন্তু মহাভারতে রাধা কোথায়? ওই নামের একজন আছেন তা ঠিক, কিন্তু তিনি হলেন কর্ণের পালিকা মাতা। কৃষ্ণভক্তদের জন্যে রয়েছে হরিবংশ, ভাগবতের দশম স্কন্ধ। গীতগোবিন্দ তো আছেই। আছে বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী। কানু বিনে গীত নেই। তাহলে আবার মহাভারতকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া কেন? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই তার কেন্দ্রীয় ঘটনা। তাতে কৃষ্ণের ভূমিকা রথীর নয়, সারথির। সারথি অবধ্য। তিনি কাউকে বধও করেন না। বীরপুরুষরা অবধ্য নন। তাঁরা বধও করেন। যুধিষ্ঠিরও বধ করেছিলেন—শল্যকে। শল্য বড়ো সামান্য যোদ্ধা ছিলেন না। মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের একটির নাম শল্যপর্ব।

সে যাই হোক, আমাদের আলোচ্য হচ্ছে কাব্য নাটক উপন্যাসের নায়করা কি বীরপুরুষ হতে বাধ্য? তাহলে তো ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কেউ নায়ক হতে পারেন না। ক্ষত্রিয়াণী ভিন্ন নায়িকাও হতে পারেন না আর কেউ। আমাদের এই বুর্জোয়াশাসিত সমাজে ও রাষ্ট্রে আমরা ক্ষত্রিয় কোথায় পাচ্ছি? বুর্জোয়াদের আধিপত্যের পরে যাঁদের ডিকটেটরশিপ অবশ্যম্ভাবী বলে কথিত তাঁরাও তো ক্ষত্রিয় নন। বীরপুরুষ থাকলে থাকবেন ক্ষত্রিয়দের মধ্যে নয়, আপাতত বুর্জোয়াদের মধ্যে, পরে কৃষকশ্রমিকদের মধ্যে। কিন্তু সংখ্যা তাঁদের এত বেশী নয় যে হাজার হাজার লেখক তাঁদের নায়ক করে ও তাঁদের জায়া বা প্রিয়াদের নায়িকা করে বছর বছর নতুন নতুন কাব্য নাটক উপন্যাস লিখতে পারবেন। তাহলে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে নায়ক হতে হলে বীরপুরুষ হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যে পুরুষ কোনো অর্থেই বীর নয়, না কায়িক, না মানসিক, না নৈতিক, না রাজনৈতিক, না

অর্থনৈতিক সে পুরুষও নায়কত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। তেমনি, একালের নায়িকাদেরও বীরাঙ্গনা হতে হবে না। এমন কি, কুলাঙ্গনাও না। ইতিহাসের গতি কেবল শূদ্র জাগরণের অভিমুখে নয়, নারী জাগরণের অভিমুখেও। আর নারী বলতে সবরকম নারীকেই বোঝায়। সকলেরই ভোট দানের অধিকার আছে। জোট বন্ধনের অধিকার আছে। পতিতা বলে কেউ অনধিকারিণী নয়। কম অধিকারিণীও নয়। সাহিত্য যদি একে অস্বীকার করে তবে সাহিত্য আর জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগোতে পারবে না। জীবন হবে নিত্য নতুন, সাহিত্য হবে পুরাণ ইতিহাস।

ইংরেজী কথাসাহিত্যে ডিকেন্স এসে দেখিয়ে দিলেন যে অতি সাধারণ ঘরের নরনারীও সার্থক উপন্যাসের নায়কনায়িকা হতে পারে। তাঁর পাঠকপাঠিকারাও সাধারণ ঘরের নরনারী। শুধু অতি সাধারণ ঘরের নয়, সমাজের নিচের স্তরের। সাহিত্যে এরা বলতে গেলে এই প্রথম এল। এসেই যে যার জায়গা করে নিল। শেকসপীয়ারের চরিত্রদের মতো এরাও আজ অতি পরিচিত। অথচ এদের তেমন কোনো বীরত্বের পরিচিতি নেই। এদের পরিচয় এরা মানুষ। এদের মনুষ্যত্ব বহুবর্ণে বিচ্ছুরিত। এরা কি প্রাচীন যুগে বা মধ্যযুগে ছিল না? ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু সাহিত্যে এদের প্রবেশ ছিল না। কারণ এরা বীরও নয়, অভিজাতও নয়, কুলীনও নয়, এদের সম্বন্ধে শিক্ষিত ও সচ্ছল পাঠকদের তেমন আগ্রহও নেই। লেখকরা তো একতরফা লিখে যেতে পারেন না। সাহিত্য হলো দো-তরফা কাজ। আরেক তরফের নাম পাঠক। পাঠক তৈরি না হলে লেখকও তৈরি নন। সময়ের পূর্বেও কেউ কেউ লিখেছেন, কিন্তু তাঁরা হলেন ব্যতিক্রম। তাঁরা নিজেদের পাঠক নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছেন। সেই পাঠকরাও ব্যতিক্রম।

মানুষের চরিত্রের অসংখ্য দিক। বীরত্ব তার একটি। আর

বীরপুরুষও কি সব সময় বীরত্বের পরিচয় দেন? যুদ্ধক্ষেত্রে যিনি অসাধারণ নির্ভীক তিনিই হয়তো একটা কালো বেড়াল দেখলে ভয়ে কাঠ। দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা, তাঁর নামে বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খায়, অথচ জ্যোতিষীরা যে যা বলে তাই শুনে ভয়ে কেঁচো। পরলোকের ভয় না থাকলে স্বৈরাচারী শাসকদের সংযত করা শাসিতদের অসাধ্য। অন্তত এতকাল তাই ছিল। কোনো বীরপুরুষই ষোল আনা বীর নন। সোনার সঙ্গে খাদ মেশানো যেমন স্বর্ণকারদের অভ্যাস, প্রকৃতিরও অভ্যাস বীরত্বের সঙ্গে ভয়, ভ্রান্তি, নিষ্ঠুরতা, রিরংসা প্রভৃতির মিশোল। হোমার এ সত্য জানতেন। ইলিয়াডের শুরুতেই দেখা যায় নারী নিয়ে দুই মহাবীরে ঝগড়া। যোদ্ধাদের শিবিরেও নারী। নইলে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছা। অনেক সাধ্যসাধনার পর আকিলিস যুদ্ধে রাজী হন। ততক্ষণে স্বপক্ষের বহু সৈন্য বিনষ্ট। একালের যুদ্ধক্ষেত্রেও কেবল বীরপুরুষরা যান না, সঙ্গে যায় নারী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উপর লেখা একখানি জার্মান উপন্যাসের ইংরেজী পড়ে দেখি দিনের বেলাও যুদ্ধশিবিরে অফিসারের ঘরে নারী। শুনি 'ইন্টারভিউ' হচ্ছে। গ্রন্থকার এক ধর্মযাজক। শিবিরে তিনিও ছিলেন উপস্থিত। ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, আজকাল ওই কাজটিকে বলে 'ইন্টারভিউ'।

কিন্তু ডিকেন্সের মতো ঔপন্যাসিকরা সাধারণ মানুষকে নায়ক-নায়িকা করে যতই লিখুন না কেন, রোমান্টিক নায়কনায়িকা না হলে আমাদের এই ঘোর বাস্তববাদী জমানায়ও সিনেমা কিংবা অপেরা কিংবা ব্যালে তেমন জমে না। আর সেই রোমান্টিক নায়কনায়িকারা ঠিক সাধারণ মানবমানবী নন। লোকে পয়সা খরচ করে যাঁদের দেখতে যাবে তাঁরা যদি হন তাঁদেরই মতো সাধারণ মানুষ তাহলে ওটা বাজে খরচ। রোমান্টিকের জন্যে লোকমানসে একটা অনির্বাণ কৌতূহল আছে। ঔপন্যাসিকরা এটা জানেন। তাই বাস্তবের সঙ্গে

কিঞ্চিৎ রোমান্টিকতা মিশিয়ে দেন। চোখ কান খোলা' রাখলে জীবনেও রোমান্টিকের সন্ধান মেলে। তাই বানাতে হয় না। সাধারণ মানুষও ক্ষণকালের জন্যে অসাধারণ হয়ে ওঠে, যেমন রূপলাবণ্যহীনা চিত্রাঙ্গদা হয়েছিল একটি বসন্তের জন্যে রূপলাবণ্যবতী।

রোমান্টিক নায়কনায়িকার উপর আমার পক্ষপাত আজীবন। কিন্তু কোথায় তাদের পাই? কেমন করে বানাই? ডিকেন্স রোজ সকালবেলা বেরিয়ে পড়তেন লণ্ডন শহরে চরিত্রের অন্বেষণে। পেয়ে যেতেন অদ্ভুত সব চরিত্র। মনে মনে এঁকে নিতেন। পরে একদিন—হয়তো বছর দশেক বাদে—চটকদার এক কাহিনীর ভিতর নিয়ে আসতেন। ওভাবে বাস্তববাদী উপন্যাস হতে পারে, কিন্তু রোমান্টিক উপন্যাস হবে কী করে? রোজ আমি কলকাতা শহর ঘুরে বেড়াতে পারি। কিন্তু রোমান্টিক নায়কনায়িকাদের কি পথে ঘাটে দেখতে পাওয়া যাবে? না হাটে বাজারে? না আপিসে আদালতে? না নিষিদ্ধ পল্লীতে? না খেলার মাঠে? না ফিল্ম স্টুডিওতে? না কলকারখানায়? না ধর্মঘটীদের মিছিলে? না গণনায়কদের জনসভায়? না রাতের অন্ধকারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আশেপাশে? না হোটেলে রেস্টোরান্টে বা পানশালায়? না বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে বা ছাত্রমহলে? না খবরের কাগজের দফতরে? না জেলখানায় বা থানার হাজতে? না নিমতলায় বা কেওড়াতলায়?

বলা যায় না। মানুষের জীবন এত বিচিত্র যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থানে বা অবস্থায় মিলে যেতে পারে তাদের দেখা যারা হবে আমার কাহিনীর নায়ক বা নায়িকা। মনও খুলতে পারে তারা আমার কাছে, যদি আমাকে বিশ্বাস করতে পারে। কিন্তু তার জন্যে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে ঘর ছেড়ে বাইরে। যতবারই বিদেশে গেছি অচেনাদের সঙ্গে মিশেছি, একদিন বা দু'দিনের আলাপে অন্তরঙ্গ হয়েছি, শুনতে পেয়েছি একান্ত গোপন কথা। তা বলে কি সেসব আমি লিখতে

যাব নাকি? সব কথা অবিকল লেখা যায় না। লিখলে তাঁরা বিব্রত হতে পারেন। আমিও বিব্রত হতে পারি। রোমান্সের জগতে কত কী ঘটে, কিন্তু সাহিত্যের আসরে সব কিছু প্রকাশ করা যায় না। সেই যে বলে, ফ্যাক্‌ট ইজ স্ট্রেন্‌জার দ্যান ফিক্‌শন। আবার আমিও একজন স্ট্রেন্‌জার, তা নইলে আমাকে বিশ্বাস করে ভিতরের কথা কেই বা খুলে বলতে চাইবে? তেমনি আমার কাছে তারাও এক একজন স্ট্রেন্‌জার। দু'দিন পরে কেউ কারো নয়।

রোমান্টিক কাহিনী যখন লিখি তখন তার পটভূমিটাকে করি বিদেশ বা স্বদেশেরই ভিন্ন প্রদেশ বা পাহাড় পর্বত বা সমুদ্রতীর। আটপৌরে জীবনযাত্রার মধ্যে রোমান্টিকতা সঞ্চার করা সহজ নয়। তবে একেবারে অসম্ভবও নয়। কাহিনী বাইরে থেকে এসে হাজির হয়। শুনে অবাক হই। মানুষের জীবন এত বিচিত্র যে ইংরেজ ফরাসী জাপানী বাঙালী ভেদাভেদ নেই। বাঙালীও বাঙালীর কাছে স্ট্রেন্‌জার। তাদের কাহিনীও আমার কাছে স্ট্রেন্‌জ। কিন্তু কোথাও একটু বীরত্বের আভাস না পেলে আমার লেখকসত্তা সাড়া দেয় না। লেখনীর জন্যে আমি যখন বিষয় বেছে নিই তখন বীরত্বের গন্ধ না থাকলে উৎসাহ বোধ করিনে। বলাবাহুল্য বীরত্ব বলতে আমি শুধু কায়িক অর্থে বুঝিনে।

কিন্তু একই ব্যক্তি একই সঙ্গে বীরও হতে পারে, ভীরুও হতে পারে। মানুষের স্বভাবেই নিহিত রয়েছে স্ববিরোধ। তার পর একই ব্যক্তি যুবা বয়সে বীর ও পরবর্তী বয়সে ভীরু হতে পারে। পূর্বাপর সঙ্গতি কাম্য, কিন্তু অসঙ্গতিটাই মানুষের স্বভাবে সুলভ। সেটা নিন্দনীয়, কিন্তু সেটাই বাস্তব সত্য!

এটাও তেমনি এক বাস্তব সত্য যে, বয়স যাদের চল্লিশ পেরিয়ে গেছে তাদের নায়ক করে রোমান্টিক নাটক উপন্যাস লেখা দুষ্কর। নায়িকার বয়স তো আরো কম হওয়া চাই। শেক্সপীয়ারের যুগে

জুলিয়েটের বয়স ছিল তেরো না চোদ্দ। একালের জুলিয়েটদের বয়স হয়তো বিশের কোটায়, এদেশে হয়তো আঠারো উনিশ। কিন্তু ত্রিশের উপর হলে রোমান্টিক বিশেষণটির মর্যাদা থাকে না। তবে প্রেম বিশেষ্যটির মান থাকতে পারে। বানপ্রস্থে যাবার বয়সেও কেউ কেউ প্রেমে পড়ে। সে প্রেম যে রোমান্টিক হতে পারে তাও আমার জানা। কিন্তু দর্শক হলেও লেখক হতে আমার অনভিরুচি। নায়িকাটির বয়স যদিও ত্রিশ ছাড়ায়নি, তবু বয়সের ব্যবধানও বছর তিরিশেক। রোমান্টিক বিশেষণের পক্ষে সেটাও কি একটা অলজ্ঘ্য বাধা নয়? প্রেম বিশেষ্যটির বেলা বয়সের ব্যবধান অবান্তর। গ্যেটের বয়স যখন চুয়াত্তর কি পঁচাত্তর উলরিকের বয়স তখন আঠারো কি উনিশ। সে বয়সেও তিনি প্রেমের কবিতাই লিখেছেন। কিন্তু তাকে রোমান্টিক বলতে বাধে। তিনি তো বিয়ে করবেন বলেও ক্ষেপেছিলেন। সেই হাস্যকর পরিণতি থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করেন তাঁর পুত্র। কবি মর্মাহত হন।

না, প্রেমের পক্ষে কোনো বয়ঃসীমা নেই, কিন্তু রোমান্টিকতার পক্ষে আছে। যাঁদের নিয়ে রোমান্টিক নাটক উপন্যাস সৃষ্টি হবে তাঁরা সেই সীমার আমলে আসবে। নয়তো রসভঙ্গ। তারপর যিনি তাদের নিয়ে সৃষ্টি করবেন তাঁরও বয়সের একটা অনির্দিষ্ট সীমা আছে। শীতকালে কেউ নিদাঘের উত্তাপ অনুভব করে না। সেটাকে কল্পনা করে নিতে হয়। কল্পনা অনেকদূর যেতে পারে, কিন্তু ততদূর নয়, যতদূর গেলে যুবকযুবতীর কামনা বাসনা বয়সোচিত উত্তাপে ভরপুর নয়। কথার পর কথা সাজাতে প্রবীণ লেখকরা ওস্তাদ, কিন্তু কথা না বলেও আবেগ সঞ্চার করা যায়। কথা বললেও সেটা সাজানো কথা নয়। স্বতঃ উৎসারিত প্রগল্‌ভতা। লিখবেন যাঁরা তাঁদের ভিতরেও সেই উত্তাপ থাকা চাই যে উত্তাপ তাঁর নায়কনায়িকার ভিতরে। অবজেকটিভিটি লেখকের পক্ষে একটা মহৎ গুণ, কিন্তু

রোমান্টিক কাব্য নাটকের বেলা সেকথা খাটে না। বয়সের বিচার সেজন্যেই প্রাসঙ্গিক। 'চোখের বালি'র রবীন্দ্রনাথকে 'ঘরে বাইরে'তে পাওয়া গেল না, কারণ ততদিনে কবির বয়স প্রায় পঞ্চান্ন। তা বলে 'ঘরে বাইরে'র মূল্য কিছু কম নয়। 'ঘরে বাইরে' হয়তো আরো মূল্যবান, তবু তার রসবস্তু রোমান্টিক প্রেম নয়। তার নায়ক-নায়িকা রোমান্টিক নায়কনায়িকা নয়। কবি বোধ হয় রোমান্টিক করতে চানও নি। সম্ভবত ততদিনে তিনি ঋষির পর্যায়ে পৌঁছেছেন। কবিকে ঋষির মতো ব্যবহার করতে হয়।

আগুন একবার নিবে গেলে তাকে আর জ্বালানো যায় না, সম্বল তখন তার স্মৃতি। আগুন নিয়ে খেলা করারও একটা বয়স আছে। তা নিয়ে লেখারও আছে একটা বয়স। এটা আরো কিছু বেশী। কিন্তু খুব বেশী নয়। মাঝখানে আরো একশো রকম অভিজ্ঞতা এসে ভিড় করে। সেসব অভিজ্ঞতাকেও সাহিত্যে এনে তাদের ঋণ চুকিয়ে দিতে হয়। প্রেমই কি একমাত্র অভিজ্ঞতা? হতে পারে প্রধান অভিজ্ঞতা, কিন্তু সেক্ষেত্রেও রোমান্টিক প্রেম বলে বিশেষ একটা বিভাগ আছে। তাই নিয়ে কত গান, কত কবিতা, কত নাটক, কত কাহিনী। লেখকেরা ক্লান্তি মানলেও পাঠকেরা ক্ষান্তি মানেন না। সিনেমার দর্শকেরা তো একই নারীকে বার বার নায়িকার ভূমিকায় ও একই পুরুষকে বার বার নায়কের ভূমিকায় দেখতে চায়। একই ছবিতে নয়, নতুন নতুন ছবিতে। কত বড়ো একটা ইণ্ডাস্ট্রি চলছে রোমান্টিকতাকে পুঁজি করে। অভিনেতা অভিনেত্রীদের হয়তো বয়সের গাছপাথর নেই। কিন্তু মেক-আপের গুণে তাঁরা চিরযৌবন। অথচ আড়ালে যাঁরা থাকেন, যেমন কাহিনীকার, তাঁদের বয়স ঢাকা পড়বে কোন কৌশলে? তাঁদের সম্বল কয়েকটা ফরমুলা। সেভাবে আর যাই হোক, সাহিত্যসৃষ্টি হয় না। থিয়েটারও যদি সিনেমার ধারা ধরে তাহলে সাহিত্যের পক্ষে দুর্দিন। থিয়েটারই বলুন আর

সিনেমাই বলুন, এদের মূল্য কি কেবল লোকরঞ্জন মূল্য? অথবা মতবাদপ্রচার মূল্য? মানবিক অভিজ্ঞতার বিচিত্র অভিব্যক্তি কি আরো মূল্যবান নয়? তার জন্যে কি দর্শকরা প্রবেশমূল্য দেবেন না? লেখকেরাও তার ভাগ পাবেন না?

যে প্রসঙ্গ নিয়ে শুরু করেছিলুম সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসি। হীরো অর্থাৎ নায়ককে কি হীরো অর্থাৎ বীর হতে হবে? বেঁটে কুৎসিত খেটে খাওয়া লক্ষ্মীছাড়া ভীরু পুরুষের কি কোন আশা নেই? আছে, আছে, চার্লি চ্যাপলিন দেখিয়ে দিয়েছেন যে আছে। ডিকেন্স তো আরো আগে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে আছে। হীরোইন অর্থাৎ নায়িকাকে কি হীরোইন অর্থাৎ বীরাঙ্গনা হতে হবে? কালো মেয়ে, যার বর জুটছে না, পতিপরিত্যক্তা, যার জীবন দুর্বহ, বালবিধবা, যে চিরদুঃখিনী, এদের কি কোনো আশা নেই? আছে, আছে, এদেরও আশা আছে। বীরাঙ্গনা না হয়ে যারা বারাঙ্গনা তাদেরও আছে উদ্ধার। এইজন্যেই তো আমরা শরৎচন্দ্রকে এত ভালোবাসি। যদিও তিনি শেষপর্যন্ত যাননি, তার আগেই থেমে গেছেন, তবু আমরা জানি যে তিনি সাবিত্রী বা কিরণময়ী বা রাজলক্ষ্মীকে সমাজেও সুপ্রতিষ্ঠ দেখলে সুখী হতেন। আপাতত ওরা সাহিত্যেই সুপ্রতিষ্ঠ।

ডিকেন্স বা শরৎচন্দ্র আশাবাদী সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথ তো নিশ্চয়ই। কিন্তু অত্যাধুনিক সাহিত্যে আশাবাদ কোথায়? সিনেমার কথা আলাদা। আশাবাদী পরিণতি না হলে দর্শকের ভিড় হবে না। যেখানে নিরাশাবাদ প্রবল সেখানে নায়কনায়িকার ধনসম্পদ থাকলেও মনে শান্তি নেই, অন্তরে অভয় নেই। কেন যে এরা পৃথিবীতে এসেছে তা এরা জানে না। এদের জীবন অর্থ দিয়ে পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু অর্থপূর্ণ নয়। এদের জীবনে এমন কোনো ঘটনাও ঘটে না যা নাটকীয় বা রোমান্টিক। কাহিনীটাকে আকর্ষণীয় করতে হয় একটা হত্যা বা আত্মহত্যার অবতারণা করে। হয়তো একদিন একটা যুদ্ধ

বা একটা বিপ্লব এসে এদের চরিত্রকে বীরত্বের মহিমা দেবে, নয়তো জীবন অসার ও হৃদয় অসাড়।

কাব্য নাটক উপন্যাসের কাছে লোকে জানতে চায় কেমন করে বাঁচবে এই প্রশ্নের উত্তর। অধিকাংশেরই লক্ষ্য নায়কনায়িকার অশনের উপরে, বসনের উপরে, ভূষণের উপরে, ব্যসনের উপরে। ওঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারা তাদের প্রশ্নের উত্তর পায়। কিন্তু তাই যদি সব কথা হতো তবে মহত্তর সৃষ্টির অবকাশ থাকত না। কিছু লোক আছে, থাকবেই, যাদের লক্ষ্য মানুষের অন্তর্জীবন। অন্তর্জীবনে কে বীর, কে সুন্দর, কে কল্যাণকৃৎ, কে প্রেমিক এসব না জানলে জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আমাদের চারদিকে এত বেশী ব্যর্থতা ও বন্ধ্যাত্ব যে কতক লোককে সৃষ্টিকর্মে তৎপর হতে হবে সাফল্যের কথা না ভেবে। লেখনীও অসি হতে পারে, লেখকও বীর হতে পারেন, বীরত্বের সংজ্ঞাও আরো উদার হতে পারে।

ইতিমধ্যে একদল কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ভাবতে ও বলতে আরম্ভ করেছেন, নায়ক বা নায়িকা বলে আদৌ একজন থাকবেই বা কেন? না থাকলে ক্ষতি কী? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেমন আমরা বীরপুরুষ বা বীরাঙ্গনা দেখতে পাইনে, দেখতে পাই কদাচিৎ বিপ্লবের বা বিদ্রোহের বা বিগ্রহের আলোয়, তেমনি কে যে নায়ক আর কে যে নায়িকা এটা তো প্রাত্যহিক জীবনে লক্ষ করিনে, করি হয়তো হঠাৎ একটা ট্রাজেডী ঘটে গেলে। সুতরাং নায়কনায়িকার পাট তুলে দাও। সকল চরিত্রই সমান। কেউ বড়ো নয়, কেউ ছোট নয়। আমাদের এটা সাম্যবাদের যুগ। চরিত্রস্রষ্টারা হবেন সমদর্শী। অভিজাত যুগের ঐতিহ্য অনুসরণ করে একজনকে বড়ো, আরেকজনকে ছোট করতে হবে কেন? এখন থেকে লিখব আমরা নায়কবিহীন উপন্যাস বা নায়িকাবিহীন নাটক। কেন চলবে না? বুর্জোয়া সংস্কার চলতে দেবে না বলে? সে সংস্কার জনমানসেও শিকড়

গেড়েছে বলে? তাই যদি হয় তবে আমাদের কাজ হবে তাকে উপড়ে ফেলা।

যাঁরা কোমর বেঁধে প্রোলিটারিয়ানদের নিয়ে নাটক নভেল লিখছেন তাঁরাও নায়কনায়িকা বাদ দিয়ে চালাতে পারছেন না। বাদ দিলে ওসব বই কেউ পড়বে না, ওসব নাটক কেউ দেখবে না। জনতাও নায়কনায়িকার নামে পাগল। তা সে সিনেমার চিত্রতারকাই হোক আর কাহিনীর প্রধান চরিত্রই হোক। নায়কনায়িকাদের বর্জন করেও নাটক উপন্যাস লেখা যায়, কিন্তু যাঁরা সেকাজ করবেন তাঁদের নাটক উপন্যাস বর্জিত হবে। এইরকমই হয়ে এসেছে, এইরকমই হচ্ছে ও হবে। সমাজের রূপান্তর ঘটলেই রুচিরও রূপান্তর ঘটবে, এটা সব সময় সত্য নয়। অন্তত নয় নাটক উপন্যাসের নায়কনায়িকার বেলা। যতদূর দেখতে পাচ্ছি নায়কনায়িকাবিহীন নাটক উপন্যাস নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা স্থায়ী ফল রেখে যাবে না। বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনাদের যুগ হয়তো অস্তমিত হয়েছে বা হবে। কিন্তু নায়কনায়িকাদের যুগ কে জানে কতকাল বিদ্যমান থাকবে।

এখানে বলে রাখি যে কেবলমাত্র একজন যুধিষ্ঠির ও একজন দ্রৌপদীকে নিয়ে মহাভারত হতো না। অসংখ্য চরিত্রের প্রয়োজন ছিল। নায়কনায়িকা না থাকলে চলে না, তার মানে এ নয় যে তারাই থাকবে, আর কেউ থাকবে না। ত্রিভুজ হলে তো আরো একজন থাকবেই। কাহিনীর প্রয়োজনে আরো অনেকে।

জীবনমরণ প্রশ্ন

বৈজ্ঞানিকরা দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বাইরে প্রাণীর সন্ধান পাননি। প্রাণধারণের পক্ষে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা আদিযুগের পৃথিবীতেও ছিল না। কোটি কোটি বর্ষের পর প্রথম প্রাণীর আবির্ভাব। কোটি কোটি বর্ষের পর প্রথম মানুষের আবির্ভাব। কোটি কোটি বর্ষ পরে প্রথম সভ্য মানবের আবির্ভাব। এই বিশাল বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাণ জিনিসটি দুর্লভ। একবার হারালে আর একে ফিরে পাওয়া যাবে না। সেইজন্যে পশুপাখিদের মধ্যেও অলিখিত নিয়ম লক্ষ করা যায়। তারা আক্রান্ত না হলে প্রাণীহত্যা করে না। যেটুকু করে সেটুকু নেহাত প্রাণধারণের তাগিদে। এ নিয়মটা সবাই সহজাতভাবে মানে বলেই পৃথিবীতে এত প্রাণীবৈচিত্র্য।

বুদ্ধিমন্ত জীব মানুষও অসভ্য থাকতেই সেই নিয়মটা মানে। সভ্য হওয়ার পর তো লিখিত অনুশাসন জারি করে। মানুষ মারা তো দূরের কথা, পশুপাখি মারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। গোরু যেমন হিন্দুদের অবধ্য তেমনি অন্যান্য প্রাণী অন্যান্য সভ্য বা অসভ্য জাতি বা ধর্মাবলম্বীদের অবধ্য। শুধু সম্রাট অশোক নন, তাঁর পূর্বেও বহু দেশে বহু রাজন্য, বহু ধর্মগুরু নরহত্যার বিরুদ্ধে, প্রাণীহত্যার বিরুদ্ধে আবেদন নিবেদন অনুশাসন ও আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। অনিয়ন্ত্রিত হত্যা সভ্যতার সঙ্গে খাপ খায় না। এমন কি অসভ্যতার সঙ্গেও নয়। অসভ্যদেরও একটা অলিখিত কোড আছে।

তবে কখনো কোনো অবস্থায় নরহত্যা বা প্রাণীহত্যা করবে না, এই অনুজ্ঞাটার প্রয়োগও বড়ো একটা দেখা যায় না। এর সাক্ষাৎ পাই প্রাচীন জৈনদের মধ্যে। তাদেরি মতো আরো কয়েকটি ভারতীয়

তথা ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও। নিরামিষ আহার অতি প্রাচীন কাল থেকেই বহু দেশে প্রচলিত। আদি মানবও ছিল বানরদের মতো নিরামিষভোজী। কোটি কোটি বর্ষ ধরে নিরামিষ ভোজনের পর সে আমিষাশী হয়। আমিষাশী হলেও এটা খাবে না, ওটা খাবে না, সেটা খাবে না। মানুষ যখন মৃগয়াজীবী ছিল তখনো তার খাদ্যাখাদ্য বিচার ছিল। খিদের জ্বালায় সে কুকুর বেড়াল খেত না। যাদের খাদ্যাখাদ্য বিচার ছিল না তাদের বলত রাক্ষস। রাক্ষস তো নরমাংসও ভোজন করত। ঐটেই সর্বপ্রথম নিষিদ্ধ হয়। বিবাহের বেলা যেমন ইনসেস্ট।

মানুষে মানুষে বিরোধ তো চিরকালই ছিল। কিন্তু সে বিরোধ এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সভ্যতম দেশের মানুষও আজ পরমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় মেতেছে। যাকেই জিজ্ঞাসা কর সেই বলবে, "আমাদের সৈন্যদলের মনোবল ক্ষুণ্ণ হবে, যদি ওদের শত্রুদের হাতে পরমাণু বোমা থাকে, ওদের হাতে না থাকে। সুতরাং লোকে খেতে পাক আর নাই পাক, পরমাণু বোমা আমাদের চাইই চাই।" অথচ এটাও তো নিশ্চিত যে লোকে খেতে না পেলে বিদ্রোহ করবে, বিপ্লব করবে। সেটা দমন করতে হলে সেই সৈন্যদলের উপরেই বরাত দিতে হবে। তখন তারাই হর্তা কর্তা বিধাতা হয়ে বসবে। রাজনীতিকরা কোথায় তলিয়ে যাবেন। পৃথিবীর তিন ভাগের একভাগ এখন বিপ্লবীদের শাসনে। আর একভাগ সৈনিকদের শাসনে। বাকী একভাগে এখনো রাজনীতিকদের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু পরমাণু বোমা বানালে তাদের অস্তিত্বও বিপন্ন হবে।

একজন গান্ধীপন্থী মন্ত্রী আমাকে চমকে দেন যখন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে ভাষণ দিতে এসে অত্যন্ত কাতরভাবে উচ্চারণ করেন, "পরমাণবিক অস্ত্র না হলে ভারত তার শত্রুদের সঙ্গে পারবে না। সুতরাং তার আত্মরক্ষার জন্যে চাই পরমাণু বোমা।" আমি

তখন মনে মনে বলি, "ও মা !" শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্যেই যে তাঁর দেশ পারমাণবিক গবেষণায় মগ্ন তাঁর কথা শুনে তা বিশ্বাস করা কঠিন। দুনিয়ায় কেউ বিশ্বাস করছে না! ভারতবিরোধী প্রচার যে আজ সারা পশ্চিম জুড়ে তার প্রধান কারণ ভারত নাকি হতে চায় পঞ্চ মহাশক্তির মতো আরো এক মহাশক্তি, যার তূণে আছে মহামারণাস্ত্র। ভারতবিরোধী প্রচার কেবল পশ্চিমেই সীমাবদ্ধ নয়। পূবে পশ্চিমে উত্তরে যেদিকেই তাকাই সেদিকেই দেখি একই দৃশ্য।

পরমাণু বোমা বানাতে বানাতে এমন এক সময় আসবে যখন এক মুহূর্তের নোটিসে বোমা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে যাবে। কেবল যে মনুবংশ ধ্বংস হবে তাই নয় পশুপাখি কীটপতঙ্গ সকলেরই নির্বাণ ঘটবে। পৃথিবী ফিরে যাবে সেই যুগে যে যুগে প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেনি। অবশ্য প্রাণের বীজ বিলুপ্ত হবে না। প্রাণী আবার গজাবে। কিন্তু কে জানে কত কোটি বৎসর লাগবে বিবর্তনের বর্তমান স্তরে উপনীত হতে। সকলে আশা করেছিল মহাত্মা গান্ধীর দেশ আর সবাইকে উদ্ধার করবে। কিন্তু তাঁর শিষ্যদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে তাঁরা নিজেরাই বিভ্রান্ত অথবা উদ্‌ভ্রান্ত। তাঁদের কাজকর্ম দেখেও বিশ্বাস হয় না তাঁরা মহাত্মার শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। পরমাণবিক যুদ্ধ একবার আরম্ভ হলে ভারতও তাতে জড়িয়ে পড়বে ও আর সকলের মতো পুড়ে মরবে। উত্তর পেতে হলে বাইরের দিকে নয়, ভিতরের দিকে তাকাতে হবে। চাই আত্মসমীক্ষা!

তৃতীয় মহাযুদ্ধ না-ও বাধতে পারে। কারণ রুশ জনমত বহুদিন থেকেই সেটা এড়াবার পক্ষপাতী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা এখনো জনমানসে দেদীপ্যমান। ইতিমধ্যে মার্কিন জনমতেরও পরিবর্তন লক্ষণীয়। ভিয়েটনামের অভিজ্ঞতা জনপ্রতিনিধিদের অতিশয় কঠোর করেছে। রাষ্ট্রপতি যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেও তাঁদের সমর্থন পাবেন কি না সন্দেহ। দুই প্রধান মহাশক্তির ক্ষমতা আছে,

কিন্তু অভিরুচি নেই। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তো ক্ষমতাই নেই। বাকী থাকে চীন। চীন যদি যুদ্ধ বাধাতে চায় তা হলে তাকে স্থির করতে হবে কে তার মিত্র হয়ে পরমাণুর প্রহার খেতে রাজী। তেমন মিত্র না পেলে তাকে একাকী লড়তে হবে। একাকী লড়বার মতো সামর্থ্য তারও নেই।

নিকট ভবিষ্যতে মহাযুদ্ধের আশঙ্কা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতেও নেই এমন কথা কে বলতে পারে, বার্লিনের ওই দ্বিভাজন কি চিরস্থায়ী? জার্মানীর ওই দ্বিভাজন কি চিরস্থায়ী? জার্মানদের যারা চেনে তারা বিশ্বাস করতেই পারে না যে তারা আরো একবার লড়বে না। লড়বে হয়তো নিজেদের মধ্যেই। তখন একপক্ষ ডেকে আনবে রুশকে। অপর পথ মার্কিনকে। রুশ মার্কিন হয়তো যুদ্ধবিমুখ। তবু জার্মানদের নিরস্ত করতে না পারলে তারাই ওদের টেনে যুদ্ধে নামাবে। তখন আরো অনেকে সেই কুরুক্ষেত্রে সমবেত হবে। তাই তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা এককথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দুই জার্মানীকে একত্র করলেও বিপদ, না করলেও বিপদ। শতবর্ষ ধরে দেখা যাচ্ছে যুদ্ধের প্রথম সিদ্ধান্ত জার্মনরাই নেয়। পঞ্চ মহাশক্তির বাইরে ষষ্ঠ এক মহাশক্তি আছে। তার নাম জার্মানী। সে আজ দ্বিধাবিভক্ত বলেই হিসাবের বাইরে। কিন্তু ভাবনার বাইরে নয়।

আমার নিজের মনে যুদ্ধের ভাবনার চেয়ে বিপ্লবের ভাবনাই বেশী। কোন্ কোন্ লক্ষণ দেখলে বুঝতে হয় বিপ্লব আসন্ন এ বিষয়ে লেনিন যা বলে গেছেন তা আমি ভুলে যাইনি। তাই মাঝে মাঝে লক্ষণ মিলিয়ে দেখি। ভারত এমন এক দেশ যেখানে জনসংখ্যা লাফ দিয়ে বেড়ে চলেছে, অথচ অন্নবস্ত্র পাল্লা দিয়ে বাড়ছে না। জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে জনতার চাপেই যা হবার তা হবে। মরণনিয়ন্ত্রণের উপায় নিয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্ভব। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের বেলা চুক্তিও খাটে না, উক্তিও খাটে না, যুক্তিও খাটে না।

সাধারণ লোক কান দেয় না, বিশ্বাস করে না, উপকরণ দিলে ব্যবহার করে না। জোর জুলুম করলে বিদ্রোহ অনিবার্য। না করলে বিপ্লব অনিবার্য। এই উভয়সঙ্কটে পড়ে আজ আমরা দিশাহারা। আমিও কাউকে কোনো পথ দেখাতে পারছিনে। শুধু এইটুকু বলি যে, দেশকে ভেসে যেতে দেওয়া উচিত নয়। ড্রিফট করতে দিলে অবস্থা পরে নিয়ন্ত্রণের অতীত হতে পারে।

ভারতের জনসংখ্যা আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই দ্বিগুণের অধিক হয়েছে। এর প্রবণতা বাড়তির দিকে। বিপ্লবের পরেও কি জনসংখ্যা বাড়বে না, বাড়তে থাকবে না, বাড়তে বাড়তে দ্বিগুণ হবে না? বিপ্লবীরা কি ছলে বলে কৌশলে এই প্রবণতার দিকটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারবেন? না, কোনো দেশেই তাঁরা সেটা পারেন নি। যেটা পেরেছেন সেটা অন্নবস্ত্রের উৎপাদনবৃদ্ধি। কিন্তু তাই যদি হবে তো চীন কেন কানাডা থেকে, রুশ কেন আমেরিকা থেকে শস্য আমদানি করে? সেখানেও আমার সন্দেহ হয় যে শস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি সন্ততির উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারছে না। জোর জুলুম না খাটালে খোরাকের চেয়ে মুখের অনুপাতই হবে বেশী। খোরাকে টান পড়লে বিপ্লবীরাও বার বার বিপ্লব করবে। যদি না বাইরে থেকে খোরাক আনিয়ে নেওয়া যায়। বিপ্লব এখনো এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়নি। কারণ বিপ্লবীরা চাষীদের উপর যতই জোর জুলুম করে চাষীরা ততই বেঁকে বসে বা ফাঁকি দেয়। তারাও এখন সরকারী কর্মচারী। সরকারী কর্মচারীরা ঠিক সময়ে অফিসে যাবার মতো মাঠে যায়, ঠিক সময়ে অফিস থেকে ফেরার মতো মাঠ থেকে ফেরে। ছুটির দিনে মাঠের কাজ করে না। এই পদ্ধতি মেনে কলকারখানার উৎপাদন বাড়তে পারে, ফসলের উৎপাদন বাড়তে পারে না। চাষের কাজ সব সময়ের কাজ। চাষীর ছুটি ফসল ওঠার পর। কারখানার উৎপাদন পদ্ধতি চাষের জমিতে খাটে না।

তারপর বুর্জোয়া হয়ে ওঠার প্রবণতাও তো সর্বত্র লক্ষিত। লাল রুশ ও লাল চীনও তার ব্যতিক্রম নয়। যারা বুর্জোয়া হবার সুযোগ পায়নি বিপ্লব তাদের একটা নতুন সুযোগ দেয়। তারাও এক পুরুষের মধ্যে বুর্জোয়া বনে যায়। শহর ছাড়া গ্রামে বাস করবে না। ট্রাকটর না হলে জমিতে চাষ করবে না। শাংহাই নাকি এখন পৃথিবীর সব চেয়ে জনাকীর্ণ শহর। মাও মহোদয় হাজার বার শহর খালি করার ফতোয়া দিয়েছেন। আমেরিকান জুজুর ভয় দেখিয়েছেন। সোভিয়েট যমের ভয় দেখিয়েছেন। ভয় পেয়ে যারা পালিয়েছে তারা কিছুদিন বাদে ফিরে এসেছে। আদর্শবাদের দোহাই দিয়েও কতক লোককে গ্রামে পাঠানো হয়েছে। আদর্শবাদীরাও ধীরে ধীরে বাস্তববাদী বনেছে। তত্ত্বকথা শুনতে শুনতে মানুষ পাগল। সোজা কথা এই যে বিপ্লবীরাও আরাম চায়। শহরেই আরাম বেশী। কলকারখানা ও অফিসেই আরাম বেশী। বুর্জোয়া ওরাও হবে, সুতরাং সমস্যাটা যেমনকে তেমন। সমাধানটা বিপ্লবীদেরও সাধ্যের অতীত।

গণসাহিত্য

বহুদিন পূর্বে, বোধ হয় গণনাট্য আন্দোলনের যুগে, এক ভদ্রলোক আমাকে চিঠি লিখে প্রশ্ন করেন গণসাহিত্য বলতে কী বোঝায়। কথাটা আমার নয়, যাঁদের কথা তাঁদের প্রশ্ন না করে আমাকে প্রশ্ন করা কেন? আমিও তো জিজ্ঞাসু। গণসাহিত্য যদি লোকসাহিত্যের অন্য নাম হয়ে থাকে তবে লোকসাহিত্য আমার জানা, কিন্তু তাই যদি হয় তবে নতুন একটা নামকরণ কেন? যদি পৃথক হয়ে থাকে তবে গণসাহিত্য আমার অজানা। আমি বিশেষজ্ঞ নই, আমি বিশেষ অজ্ঞ।

কিন্তু কথাটা তখন থেকেই আমার মনে কাঁটার মতো বিঁধে রয়েছে। আরো আগে থেকেও বিঁধে রয়েছে সেই রকম আরো একটা কথা। কলেজজীবনে যখন রম্যা রলাঁর "পীপলস থিয়েটার" পড়ি। আর্ট কাকে বলে সে বিষয়ে টলস্টয়ের সিদ্ধান্তও আমাকে দোলা দিয়ে যায়। আমি একবার তাঁর সঙ্গে একমত হই, একবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত। আমার নিজের একটা মত বিবর্তিত হতে দীর্ঘকাল লেগেছে। বিবর্তনমাত্রেই কালসাপেক্ষ।

সঙ্গীতের মতো, চিত্রকলার মতো, ভাস্কর্যের মতো কাব্যও একটা আর্ট। নাটকও একটা আর্ট। আর্টের নিয়ম লঙ্ঘন করে জনগণের উপভোগ্য কাব্য বা নাটক সৃষ্টি করা সম্ভব, কিন্তু আর্টের যাঁরা সমজদার তাঁরা তাতে আনন্দ পাবেন না। কোন্‌টা শেষপর্যন্ত কালজয়ী হবে? জনগণের রায়, না রসিকজনের রায়? আর্টের নিয়ম লঙ্ঘন করে জনগণের পক্ষে কল্যাণকর বা শিক্ষাপ্রদ কাব্য বা নাটক রচনা করা সম্ভব। কিন্তু আর্টের সমজদার যাঁরা তাঁরা তাঁকে শিরোপা দেবেন না। কোন্‌টা শেষপর্যন্ত ধোপে টিকবে? জনগণের কল্যাণকর্ম, না শিল্পীজনের শিল্পকর্ম? আর্টের নিয়ম লঙ্ঘন করে এমনতর কাব্য

বা নাটক তৈরি করা যায় যার থেকে আসতে পারে দেশের স্বাধীনতা বা সমাজের বিপ্লব। কিন্তু আর্টের যাঁরা সমজদার তাঁরা তাঁকে সেলাম করবেন না। কোন্‌টা শেষপর্যন্ত উত্তীর্ণ হবে? জনগণের যাতে ভাগ্য পরিবর্তন, না শিল্পের যাতে উৎকর্ষ?

এ ধরনের প্রশ্ন আগেকার দিনে উঠত না। লোকসাহিত্যকে বাদ দিলে সাহিত্য ছিল রাজসভার 'বা অভিজাত মহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হোমার বা সোফোক্লিস বা ব্যাস বাল্মীকি যদিও সর্বজনপ্রিয় তাঁরাও তাঁদের নায়কনায়িকাদের রাজন্য বা অভিজাত দল থেকে নিয়েছিলেন।

সাহিত্যের সীমা রেনেসাঁসের পর থেকে ক্রমেই প্রসারিত হয়ে চলেছে, বিশেষত ছাপাখানার দৌলতে। বই যদি ছাপা হয়ে হাজারে হাজারে বিকোয় তাহলে রাজন্য বা অভিজাতদের স্থান নেয় নবাগত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। যদি লাখে লাখে বিকোয় তবে নবোদিত শ্রমিক শ্রেণীও পৃষ্ঠপোষক হয়। যেমন হয়েছে সিনেমার বেলা। সিনেমাকে যদি আর্ট বলে গণ্য করি।

আমরা দেখছি যাত্রারও জয়যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। একালের যাত্রা আর গ্রামনিবদ্ধ নয়। লিন পিয়াও যে বলেছিলেন গ্রাম একদিন শহরকে জয় করবে এ যেন তাঁরই ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য। এক্ষেত্রেও সেই একই জিজ্ঞাসা। যাত্রা কি আর্ট বলে গণ্য হতে পারে? কী প্রকার আর্ট? ফোক আর্ট?

রম্যা রলাঁর পীপলস থিয়েটার পপুলার থিয়েটার নয়। আমরা যার সাক্ষী তা পপুলার লিটারেচার, পীপলস লিটারেচার নয়। পীপলস লিটারেচার যদি কোথাও থাকে তবে সাম্যবাদী গোষ্ঠীতে। তাঁরা বুর্জোয়াদের নাকচ করেছেন। বুর্জোয়ারাও তাঁদের রচনাকে নাকচ করেছে। এই আড়াআড়ির ফলে তাঁদের সৃষ্টি আরো সীমাবদ্ধ হয়েছে। কারণ যাঁদের নিয়ে তাঁরা লেখেন তাঁরা তাঁদের লেখার

পাঠকও নয়, ক্রেতাও নয়, সমজদারও নয়। বুর্জোয়াদের মধ্যে একদল সহানুভূতিশীল পাঠক বা ক্রেতা বা সমজদার আছেন, এঁদের আনুকূল্যই তাঁদের একমাত্র ভরসা।

গণসাহিত্য বলতে যদি বোঝায় জনগণের জীবনযাত্রা নিয়ে রচিত সাহিত্য তবে তার দৌড় জনগণ পর্যন্তও নয়। আর যদি বোঝায় জনগণের স্বরচিত সাহিত্য তবে তার দিন এখনো আসেনি। যেদিন আসবে সেদিন তাকে আর্টের নিয়ম পালন করতে হবে। নয়তো তার প্রসার বা প্রচার যত ব্যাপক হোক না কেন তার আয়ু বেশীদিন নয়। লোকে চাইবে নিত্য নূতন। শোষকদের অত্যাচারের কাহিনী শুনতে শুনতে কান পচে যাবে। কৃষক শ্রমিকরাও আর শোষিত থাকবে না। তাদের রক্ত জল করা টাকা তারা সেকেলে মেজাজের কাব্য নাটকের পেছনে খরচ করবে না। তারাও চাইবে পপুলার সাহিত্য, যেমন পপুলার সিনেমা বা পপ মিউজিক।

সুতরাং গণসাহিত্য বলতে শেষপর্যন্ত যেটা দাঁড়াবে সেটা বুর্জোয়া সাহিত্যেরই সগোত্র। বিষয়গুলো হয়তো শ্রমিক কৃষক সমাজের। কিন্তু উদ্দেশ্য মনোরঞ্জন। সেটা কিছু মন্দ জিনিস নয়। শেকসপীয়ারও তো মনোরঞ্জন করে গেছেন। কিন্তু তাঁর ছিল অন্তর্দৃষ্টি। তিনি লিয়ার নামক মানুষটিকেই দেখেছিলেন, লিয়ার নামক রাজাটাকে নয়। হ্যামলেট নামক মানুষটিকেই দেখেছিলেন, হ্যামলেট নামক রাজপুত্রটাকে নয়। মানুষের বেদনা, মানুষের দ্বন্দ্ব, মানুষের দুরভিলাষ, মানুষের ঈর্ষা রাজরাজড়ার পোশাক পরে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেও রাজরাজড়াদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সমাজের সকল স্তরেই ব্যাপ্ত। পাত্রপাত্রীরা বুর্জোয়া হলেও তাঁদের ভিতরকার মানুষ তো বুর্জোয়া নয়। সাহিত্যিকের অন্তর্দৃষ্টি আরো গভীরে প্রবেশ করে। যেখানে বাস করে মানুষ। মানুষের সুখ দুঃখ সকলের সুখ দুঃখ। কালকেতু ও ফুল্লরার সুখ দুঃখ কি পাঠকদের

সকলের সুখ দুঃখ নয়? সমাজে ব্যাধ বলে ওরা অপাঙ্‌ক্তেয় হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে রাজারানীর সঙ্গে একসারিতে তাদের আসন।

সাহিত্য যদি সত্যিকার সাহিত্য হয় তবে তার মতো গণতান্ত্রিক আর কী আছে? রাম আর রাবণ, লক্ষ্মণ আর হনুমান, সীতা আর সরমা, কৈকেয়ী আর মন্থরা এরা প্রত্যেকেই এক একটি চরিত্র। রাক্ষস বা বানর, রাক্ষসী বা দাসী বলে কারো কোনো অমর্যাদা নেই। সম্ভবত রাক্ষস বা বানর যাদের বলা হয়েছে তারাও মানুষ, উপজাতির বা বর্বর জাতির মানুষ। তারাও অবজ্ঞেয় বা অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। সাহিত্যের গণতন্ত্রে কেবল যে উচ্চবর্ণের বা উচ্চশ্রেণীর লোকের লেখক হবার অধিকার ছিল তা নয়, তথাকথিত নিম্নবর্ণের বা নিম্নশ্রেণীর লোকেরও সে অধিকার ছিল। দস্যু রত্নাকর সম্ভবত অন্ত্যজ ছিলেন, অন্তত বাল্মীকি পদবী ধারণ করে আমার জমাদার তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। এখনপর্যন্ত কোনো ব্রাহ্মণসন্তানকে তো বাল্মীকিবংশীয় বলে দাবী করতে শোনা যায়নি। আর ব্যাসদেবের মাতৃকুল তো ধীবর। তারাও অন্ত্যজ।

গণনাট্য আন্দোলন ক'জন প্রোলিটারিয়ানকে নাট্যকার বা অভিনেতারূপে সামনে তুলে ধরেছে জানিনে, কিন্তু আমার বাবা ওড়িশার 'পাণ' নামক একটি অন্ত্যজ জাতি বা উপজাতির ব্যক্তিদের একটি যাত্রার দল গড়তে উৎসাহ দিয়েছিলেন, সেইসঙ্গে কয়েকটি টাকা ও কিছু পুরোনো কাপড়চোপড়। যে লোকটি যুধিষ্ঠির সেজেছিল তাকে আমার বেশ মনে আছে। একটা যুদ্ধও হয়েছিল। হতাহত যারা হলো তারাও দিব্যি আর সকলের সঙ্গে ঘুরে ফিরে নেচে গেয়ে আসর জমিয়ে তুলেছিল। দুর্যোধন বা দুঃশাসন যে কারো কাছে কম প্রশংসার পাত্র ছিল তা নয়। তবে এটাও ঠিক যে পাণ্ডবদের উপরেই লোকের পক্ষপাত। তাদের জিতিয়ে না দিলে মহাভারত

অশুদ্ধ হতোই, অন্ত্যজদের বিচারও ব্যাসদেবের বিচার। বিপ্লবের পরেও সে বিচার বদলাবে না।

সমাজ কতবার বদলেছে, কতবার বদলাবে। উপরে যারা ছিল তারা নিচে নেমেছে, নিচে যারা ছিল তারা উপরে উঠেছে। কিন্তু চিরায়ত সাহিত্যের মূল্যগুলি অপরিবর্তনীয় না হলেও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় না। সে রকম কিছু হলে রামায়ণ মহাভারত আজ অবধি জাভাদ্বীপের মুসলমানদের ঘরের জিনিস হতো না। তারা ধর্মে মুসলমান, কিন্তু তাদের নামকরণ আরবীতে নয়, সংস্কৃতভাষায়। প্রধানত রামায়ণ মহাভারত থেকে। মহাকবি বল্লতোলের কেরল কলামণ্ডলে জাভাদ্বীপের একটি কন্যার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁর নাম রত্না। তিনি এসেছিলেন কথাকলি নৃত্য শিখতে। হিন্দু নন, তবে মুসলমান কি খ্রীস্টান এটা আমার অজ্ঞাত। শান্তিনিকেতনে গবেষণা করতে এসেছিলেন জাভাদ্বীপের অধ্যাপক বীর্য সুপার্থ। তিনি কিন্তু মুসলমান। নামের অর্থ জিজ্ঞাসা করলে বলেন বীর্য মানে বীর। আর সুপার্থ মানে অর্জুন। ওঁরা সব কথায় একটা সু উপসর্গ বসিয়ে দেন। যেমন সুকর্ণ। সুহর্ত। রোমান হরফে ওলন্দাজ পদ্ধতিতে লেখা হয় বলে সু হয়ে যায় সোয়ে। উচ্চারণ কিন্তু সোয়ে নয়, সু। বীর্য সুপার্থ দেশে ফিরে গিয়ে আমাকে চিঠি লেখেন। বলেন তাঁর একটি ছেলে হয়েছে। নাম রেখেছেন আর্যাবর্তপুত্র জয়বিষ্ণুবর্ধন। আর্যাবর্তপুত্র কেন? কারণ ভারতেই সে মাতৃগর্ভে আসে। জয়বিষ্ণুবর্ধন কেন? ভালো লাগে শুনতে। অধ্যাপক আমাদের একটি সংস্কৃত ছন্দ গেয়ে শুনিয়েছিলেন। । ছন্দটি ভারত থেকে বিলুপ্ত। কিন্তু জাভাদ্বীপে বিদ্যমান। জাভাদ্বীপের ইতিহাসে কতরকম বিপর্যয় ঘটে গেল, কিন্তু বেঁচে রইল রামায়ণ মহাভারত, সংস্কৃত নামকরণ, সংস্কৃত ছন্দ। আর এসব যে কেবল উচ্চতর স্তরে তা নয়। সর্ব স্তরে। ওদেশের

গণনাট্য রামায়ণ মহাভারতকে বাদ দেয় না। তবে এটাও মনে রাখা দরকার যে রামায়ণ মহাভারত যখন জাভাদ্বীপে যায় তখনো সেগুলি ধর্মগ্রন্থ হয়নি। রাম বা কৃষ্ণ তখনো অবতার হননি। তাই ইসলামের সঙ্গে সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের বিরোধ বাধেনি। ধার্মিক মুসলমানরাও সাংস্কৃতিক হিন্দু। হিন্দু না বলে বলা উচিত ইন্দু। কারণ হিন্দুর অর্থ বদলে গিয়ে ধর্মবিশেষের সঙ্গে একাত্মক হয়েছে। আর ইন্দু তার পূর্বরূপ সিন্ধুর মতো সেকুলার।

রামায়ণ মহাভারতকে আমরা লোকসাহিত্য বলিনে। কিন্তু তাদের আদিরূপ বোধ হয় ব্যালাড বা চারণগাথা ছিল। লোকসাহিত্যকে মেজে-ঘষে প্রতিভাশালীর পাকা হাতের শিক্ষিত পটুত্ব দিয়ে সাহিত্যে পরিণত করা হয়েছে। সম্ভবত একাধিক হাতের। একজোট হয়ে নয়, পরম্পরাক্রমে বিবর্তনসূত্রে।

আমরা কেউ হাজার চেষ্টা করলেও উত্তরকালের ব্যালাড বা চারণগাথা অবলম্বন করে আরো একখানা রামায়ণ বা মহাভারত গ্রন্থন করতে পারিনে। সেটা যদি কেউ পারতেন তবে অনেক আগেই পারতেন, আমাদের জন্যে ফেলে রাখতেন না। ব্যালাড বা চারণগাথা রামায়ণ মহাভারতের যুগের পর নিঃশেষিত হয়ে যায়নি, কিন্তু তাদের উপর ভিত্তি করে মহাকাব্য বা মহা উপন্যাস গড়ে তোলার সম্ভব্যতা বোধ হয় নিঃশেষিত। বরঞ্চ দেখতে পাই যাঁরাই বড়ো কিছু করতে চেয়েছেন তাঁরাই রামায়ণ মহাভারতকেই ভিত্তিভূমি করেছেন। পরবর্তীকালের ব্যালাড বা চারণগাথা পড়ে রয়েছে মহাকাব্য বা মহা উপন্যাসে গ্রথিত হবার অপেক্ষায়। বোধহয় ব্যর্থ অপেক্ষায়। মানুষের মন আর ওর পুনরাবৃত্তি চায় না। ইউরোপীয় সাহিত্যেরও একই হাল।

ব্যালাডকে যদি লোকসাহিত্যের অঙ্গ বলে ধরি তবে ব্যালাড রচনা শহরবাসী শিক্ষিত কবির কাজ নয়। কোনোদিন ছিলও না।

রবীন্দ্রনাথের হাতে যা হয়েছে তা কথা বা কাহিনী, কিন্তু ব্যালাড নয়। নানা সূত্র থেকে তিনি বিষয় সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু বিষয়গুলি সমসাময়িক নয়। ব্যতিক্রম হয়তো 'দুই বিঘা জমি' বা 'দেবতার গ্রাস' জাতীয় বিষয়। কিন্তু সেগুলি নিয়ে কি ব্যালাড হয়েছে? একালের চারণরা কি গ্রামে গ্রামে বা সভায় সভায় সেগুলি গেয়ে বেড়াতে পারে? না। সেগুলি গাথা নয়, কবিতা। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'কেও গাথা বলতে আমার বাধে। যদিও গাথার উপকরণ আছে তাদের ভিতর। সম্ভবত গোড়ায় সেগুলি ব্যালাডই ছিল। পরে পল্লবিত হয়েছে। বিস্তারিত হয়েছে।

লোকসাহিত্যের আর একটি অঙ্গ হলো ছড়া বা বচন বা প্রবাদ। এর উপরেও দৃষ্টি ছিল রবীন্দ্রনাথের। তিনিই অগ্রণী হয়ে সংকলন করেছিলেন। শেষ বয়সে নিজেই ছড়া বানাতে শুরু করেন। কিন্তু সেগুলি এত বেশী চেষ্টাকৃত, সচেতন ও বাক্‌চতুর যে লোকসাহিত্যের স্রষ্টাদের স্বতঃস্ফূর্ত, অনিয়মিত ও চাতুর্যহীন ছড়ার সঙ্গে মিশ খায় না। খাপছাড়া হলেই যে ছড়া হয় তা নয়। ছড়া চলে নিজের খেয়ালে, কবির খেয়ালে নয়। কোন্ ছড়ার স্রষ্টা কে তা জানবার উপায় নেই। ছড়া নিজে জানান দেয় না। সেকালে কবিতামাত্রেরই ভণিতায় কবির নাম থাকত, কিন্তু ছড়াগুলি হতো নামহীন। যেখানে ব্যক্তিত্বের ছাপ নেই সেখানে জনগণের সৃষ্টি বলতে বাধা কিসের? একজন হয়তো প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি মুখে মুখে বানিয়ে আরেকজনের মুখে ধরিয়ে দেয়। তারপরে আরো একজন, আরো একজন করে বহুজনের মুখ থেকে মুখান্তরিত হয়। হতে হতে বদলে যায়।

জনগণের সৃষ্টি হলেও ছড়াকে আমি গণসাহিত্য বলতে পারব না। বলব লোকসাহিত্য। তার কারণ গণসাহিত্য হচ্ছে গণদরদী বুদ্ধিজীবীদের দলবদ্ধ ও যত্নকৃত সাহিত্যকৃত্য। একপ্রকার কর্তব্যবোধ থেকে তার উদ্ভব। তার সামনে একটা সুনির্দিষ্ট সামাজিক বা

রাজনৈতিক লক্ষ্য। লক্ষ্যভেদের পর তার প্রয়োজন নিঃশেষ। বিনা প্রয়োজনে তার অস্তিত্ব সংশয়। অপরপক্ষে লোকসাহিত্য হলো জনগণের নিজেদের হাসিকান্নার সৃষ্টি। তারা যখন ছড়া কাটে তখন তাদের সামনে একটা রাজনৈতিক বা সামাজিক লক্ষ্য থাকে না। সুতরাং লক্ষ্যভেদের প্রশ্ন ওঠে না। ছড়া যদি টিকে যায় তো বিনা প্রয়োজনে। বিনা কারণেও বলতে পারা যায়। লোকগীতি সম্বন্ধে একই কথা। লোকগাথা সম্বন্ধেও তাই।

যাকে গণসাহিত্য বলে চেনা যায় অথচ তাতে গণদরদী বুদ্ধিজীবীদের হাতের ছোঁওয়া লাগেনি তেমন কোনো সাহিত্যকৃতির সন্ধান আমি পাইনি। গণসংগ্রামের দিনে যা হাতিয়ারের কাজ করে তাকে গণসাহিত্য বলতে আমার অনিচ্ছা নেই, তা যদি হয় জনমনের স্বয়ংসৃষ্ট। সাধারণ সময়ে যারা লোকসাহিত্য সৃষ্টি করে অসাধারণ যুগে তারা যদি এমন কিছু রচনা করে যাকে ঠিক লোকসাহিত্যের কোঠায় ফেলা যায় না তবে তাকে গণসাহিত্য বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য তাতে কিছু রসকষ থাকা চাই। নিতান্ত নীরস হলে তাকে সাহিত্যই বলা যাবে না। যা সাহিত্যই নয় তা গণসাহিত্য হবে কিসের জোরে? তলোয়ারের জোর এখানে অবান্তর। সফল বিপ্লব তাকে বিপুল প্রচার দিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে উত্তীর্ণ করতে পারে না। বিপ্লব যখন বাসি হয়ে যাবে লোকে তখন তাকে বাসিফুলের মতো কোথায় ফেলে দেবে?

কিন্তু ইতিহাসের একটি অসাধারণ যুগে জনগণ যদি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় ছড়া বা গাথা বা গান বা কাহিনী সৃষ্টি করে তবে আমি তাকে গোঁড়াদের মতো বরখাস্ত করব না। উদারভাবে স্বাগত জানব। তাকে গণসাহিত্য বলে আলাদা একটি কোঠায় ফেলতেও আমার আপত্তি থাকবে না। হয়তো সাহিত্যহিসাবে তা কাঁচা। তবু সৃষ্টিহিসাবে তা খাঁটি। ক্ষণকালের জন্যে হলেও সাহিত্যে

খাঁটি জিনিসের দাম আছে। কারণ খাঁটিত্বের স্বাদ আছে। শ্রেণীসংগ্রাম যদি যুদ্ধের মতো সত্য হয় তবে সত্যের প্রকাশকেও তার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে। কিন্তু ওটা আসবে তলা থেকে। জনগণের হৃদয় থেকে। তা হলেই সেটা হবে পীপলস লিটারেচার। বা গণসাহিত্য। উপর থেকে যদি আসে তবে গণসাহিত্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ আমাকে ছড়া লিখতে উপদেশ দিয়েছিলেন। আমি বলেছিলুম আমার দ্বারা হবে না। ইংরেজী ভাষায় লিমেরিক ক্লেরিহিউ প্রভৃতি কয়েকরকম পদ্য আছে, হালকা মেজাজের লেখা। সে রকম পদ্য বাংলায় লিখে আমি ছড়ার দিকে এগিয়ে রয়েছিলুম, তা হলেও ছড়া সম্বন্ধে আমার আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথের ছড়া আমাকে সার্থক ছড়ার দৃষ্টান্ত দেখায়নি। তাঁর প্রয়াণের পর একদিন বুদ্ধদেব বসুর চিঠি পাই। তিনি চান ষোলটি কবিতা। ছাপলে যার দাম হবে একপয়সায় একটি। প্রথমটা রাজী হইনি, কিন্তু হঠাৎ কেমন করে হাত খুলে যায়। ছড়ার পর ছড়া লেখা হয়ে যায়। স্বতঃস্ফূর্ত বললে অত্যুক্তি হবে না। বুদ্ধদেববাবু প্রকাশ করেন। নাম রাখি 'উড়কি ধানের মুড়কি'। এইভাবে শুরু হয়ে যায় ছড়া লেখার রেওয়াজ। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে এসব ফূর্তি করে লেখা, ফুর্তির জন্যেই লেখা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে উদ্দেশ্য ছিল যারা আমার ভোগের জন্যে ফসল ফলায় কাপড় বোনে তাদের ভোগের জন্যে আমিও কিছু করব। তারা তো আমার প্রবন্ধ উপন্যাস কবিতা বুঝবে না, বুঝলে বুঝবে আমার হালকা চালের ছড়া। একদিন হয়তো সাবেক কালের ছড়ার মতো আমার ছড়াও ওদের মুখে মুখে ঘুরবে। যদি সাবেক কালের ছড়ার সঙ্গে মিশে যায়। তার জন্যে আমাকে পরিহার করতে হবে চেষ্টাচরিত্র, নিখুঁত নিয়ম, ছলচাতুরী। রচনাকে করতে হবে সহজ, সরল, স্বাভাবিক।

জনগণের দ্বারা নয়, জনগণের জন্যে। সাবেক কালের ছড়ার

সঙ্গে এখানেই এর মৌল প্রভেদ। সুতরাং আমার ভরসা ছিল না যে আমার ছড়া জনগণের মন পাবে। পেতে পারত, বিষয়বস্তু যদি তাদের জীবনের থেকে নেওয়া হতো। নানা কারণে আমি গ্রামে গিয়ে বসবাস করতে পারিনি। সেটা স্বপ্ন রয়ে গেছে। আমার ছড়া হয়েছে বড়োদের জন্যে রাজনৈতিক কিংবা ছোটদের জন্যে কৌতুককর। এসব ছড়ারও পাঠক আছে, শ্রোতা আছে। কিন্তু কেমন করে আমি বলব যে ছড়া লিখে আমি ফসলের বা কাপড়ের বিনিময়ে চাষীকে বা কারিগরকে তার মনের উপভোগ্য দিচ্ছি? আমার আদি উদ্দেশ্য বিফল হয়েছে।

ছড়া এখন আরো অনেকেই লিখতে আরম্ভ করেছেন। চারদিকে আজকাল ছড়ার ছড়াছড়ি। আশা করি আমি যেটা পারলুম না অন্যেরা সেটা পারবেন। জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁদের জীবনের থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করবেন। একালের ছড়াকে সেকালের ছড়ার সঙ্গে মিশ খাওয়াবেন। গণসাহিত্য না হোক, লোকসাহিত্য হবে।

আমার ছড়া লেখার মূলে আরো একটা কারণ ছিল। কবিতা লিখতে গেলেই দেখি চলতি ভাষার সঙ্গে সাধুভাষা গুলিয়ে যাচ্ছে। তাকে বাদ দিলে ছন্দপতন ঘটে, মিল ঠিক থাকে না। তা হলে কি ছন্দ বাদ দিয়ে ফ্রী ভার্স লিখব? না, তাতে আমি কবিতার আনন্দ পাইনে। কবিতা তো শুধু কবিতা নয়, শুধু রস নয়, তার সঙ্গে আছে ধ্বনি, আছে সুর। তা হলে কি আমি কবিতার উপযুক্ত ভাষা না পেলে কবিতাই লিখব না? তার বদলে কী লিখব? এর উত্তর ছড়া। ছড়ায় ভাষার গোঁজামিল নেই। ছড়া বরাবরই চলতি ভাষায় তৈরি হয়ে এসেছে। মিল সব সময় পাকা মিল হয় না। 'বর্গী এল দেশে'র সঙ্গে 'খাজনা দেব কিসে' মেলাতে হয়। কিন্তু ছন্দ সব সময় মাত্রা মেনে চলে। কোথাও একটু টেনে টেনে আওড়াতে

হয়, কোথাও একটু তাড়াতাড়ি করতে হয়। ছন্দই ছড়ার প্রাণ। ছন্দভাঙা ছড়ার কথা ভাবা যায় না। তা বলে ছন্দ নিয়ে কসরত করতে হবে এমন নয়। কসরত দেখাতে গেলে ছড়া মাটি হয়। সার্থক ছড়া না হয়ে সেটা হয় নিরেট পদ্য।

গণসাহিত্য নিয়ে যাঁরা ভাবছেন তাঁদেরও ভাবতে হবে কবিতার ভাষার কথা। ছন্দের কথা। মিলের কথা। সুতরাং আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা আমি তাদের পথ সুগম করে দিচ্ছি। গণসাহিত্যিকরা কৃত্তিবাস বা কাশীরামের মতো পয়ার লিখতেও পারেন। পয়ারেও তাঁরা চলতি ভাষা ব্যবহার করতে পারেন। পয়ারের সম্ভাব্যতা এখনো নিঃশেষিত হয়নি। বোধহয় হবেও না। বাংলাভাষার পদ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্ণচোরা পয়ার। ছড়ার মতো পয়ারেরও ভবিষ্যৎ আছে।

তবে আমার মনে হয় গণসাহিত্যিকরাও গদ্যকবিতার সম্মোহন এড়াতে পারবেন না। শুনেছি পশ্চিমবঙ্গে এখন কবির সংখ্যা পাঁচ হাজার। প্রায় সকলেরই বাহন গদ্য। কবিত্বময় গদ্য। যখন গণসাহিত্যিকদের যুগ আসবে তখন হয়তো তাঁদের সংখ্যা দাঁড়াবে পাঁচ লাখ। প্রায় সকলেই লিখবেন ছন্দহীন মিলহীন কবিতা। আনন্দের কথা না আতঙ্কের? গণসাহিত্যিকরা যাই করুন না কেন লোকসাহিত্যিকরা অমন কাজ না করলেই হলো। নয়তো লোক-সাহিত্যের ধারাভঙ্গ হবে। তার ঐতিহ্য এতকালের যে ধারাভঙ্গের সম্ভাবনা দুঃখকর। আমি আশাবাদী।

অপসংস্কৃতি

'সংস্কৃতি' বলে একটা শব্দ বৈদিক সাহিত্যেও পাওয়া যায়। তখন তার ইংরেজী অর্থ ছিল অভিধানকার ম্যাকডনেলের মতে 'Preparation'। বেদের পরে যখন ব্রাহ্মণের যুগ এল তখন তার অর্থ হলো ইংরেজীতে 'formation'। তারপরে যখন ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের বিবর্তন হলো তখন তার অর্থ হলো ইংরেজীতে 'consecration'। দেড় হাজার বছর পরে আবার ঐ শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় নয়, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অন্য একটি অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইংরেজীতে যার নাম 'culture'। আমরা যখন সংস্কৃতি শব্দটি প্রয়োগ করি তখন এই অর্বাচীন বা অধুনাতন বা বিদেশী অর্থেই করি।

আর ওই যে কালচার কথাটি ওটিও অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অভিনব অর্থে প্রয়োগ। সিভিলাইজেশন কথাটিও তাই। তার মানে কিন্তু এ নয় যে কালচার বা সিভিলাইজেশন নামক বস্তুটা মানব ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বিদ্যমান ছিল না। ছিল, হাজার হাজার বছর ধরে বর্তমান ছিল। কিন্তু দেশে দেশে যুগে যুগে বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত ছিল। সর্বসম্মত নাম ও অর্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য বিদগ্ধ মহলেই প্রথম প্রচলিত হয়। সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে ভারতের, চীনের, জাপানের, পারস্যের, মিশরের, পশ্চিম এশিয়ার বিদগ্ধ মহলে। যে যার নিজের ভাষায় ভাষান্তরিত করে নেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের বিদ্বানরা সিভিলাইজেশনের ভাষান্তর করেন সভ্যতা। আর বিংশ শতাব্দীতে কালচারের ভাষান্তর প্রথমে কৃষ্টি, পরে সংস্কৃতি। এই শব্দটি আমাদের সমসাময়িকরা যে অর্থে ব্যবহার করেন সে অর্থ কালচারের সমান।

তার মানে কিন্তু এ নয় যে কালচার আমাদের দেশে নবাগত বা বহিরাগত। কালচার বরাবরই ছিল, কিন্তু এইভাবে চিহ্নিত ছিল না।

আমাদের আগে কেউ কি কোনোদিন ভাবতে পেরেছেন যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলতে বোঝাবে বৈদিক যাগযজ্ঞ নয়, রামায়ণ বা মহাভারতপাঠ নয়, নাচ গান অভিনয়? আর সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি হবেন একজন সাহিত্যিক, প্রধান অতিথি একজন সম্পাদক আর উদ্বোধক একজন রাজনীতিক? উদ্বোধক মহাপ্রভু পাঁচমিনিট বাদে অন্তর্ধান করবেন, দশমিনিট বাদে প্রধান অতিথি মহারাজ, সভাপতি তো তাঁদের মতো কাজের লোক নন, সাহিত্য কি একটা কাজ নাকি? সুতরাং তাঁকেই অপেক্ষা করতে হয়, যতক্ষণ না শেষতম বক্তা তাঁর বক্তব্য 'রাখছেন'। এর পরে আসল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তখন সভাপতিকে মঞ্চ থেকে নেমে আসতে হয়। লোকটা থাকল কি গেল কেউ ফিরেও তাকায় না। উদ্যোক্তারা হয়তো দয়া করে ট্যাক্সি ডেকে দেন, খরচাটা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে যান। নয়তো তাঁকেও দেখবার জন্য ধরে রাখেন।

একদা আমরা শান্তিনিকেতনে 'সাহিত্যমেলা'র উদ্যোগ করেছিলুম। এখন দেখছি মেলার সঙ্গে সংস্কৃতি জুড়ে দিয়ে 'সংস্কৃতিমেলা' বসছে। শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার মতো বিরাট ব্যাপার। আনন্দের বিষয় বইকি। কিন্তু জনতা না হলে এসব জিনিস জমবে না। নজরটা জনতার উপরে। কেমন করে জনতাকে টানব? কান টানলে যেমন মাথা আসে জনতাকে টানলে তেমনি টাকা আসে। সেই টাকার বখরা গাইয়েকে দেব, বাজিয়েকে দেব, নাচিয়েকে দেব, নটনটীকে দেব, কিন্তু সাহিত্যিককে দিলে তাঁর অসম্মান হয়।

জনতাকে আকর্ষণ করতে চাইলে জনতার কাছে আকর্ষণীয় হওয়া চাই। হিন্দী ফিল্ম তার সেরা দৃষ্টান্ত। হিন্দী চিত্রনির্মাতারা লাজ-লজ্জার ধার ধারেন না। যাঁদের ধার ধারেন তাঁরা কোটিপতি মহাজন।

তাঁদের ধার শোধ করতে হলে জনতাকে লাখে লাখে টানতে হয়, সেইসঙ্গে লাখো লাখো টাকা। রুচিবোধ, রসবোধ, নীতিবোধ, দার্শনিকতা, মতবাদ ইত্যাদির জন্যে হিন্দী ফিল্মনির্মাতারা বিখ্যাত নন। তাই যে জিনিস তাঁদের স্টুডিও থেকে বেরোয় তা একপ্রকার ভোগ্য পণ্য। জনতা সস্তায় পায়, তাই সিনেমায় ভিড় করে। বাংলা ফিল্মনির্মাতাদের কারো কারো রুচিবোধ ও রসবোধ আছে। তাই তাঁরা লোকসান দিয়েও এমন সব ফিল্ম তৈরি করেন যা সমাজদারদের বিচারে উৎকৃষ্ট। শুধু এদেশে নয়, সব দেশে। কিন্তু জনতার রুচি না বদলালে তাঁদেরকে জনতার রুচির সঙ্গে আপস করতে হবে, জনতা যেমনটি চাইবে তাঁরাও তেমনিটি সরবরাহ করবেন। নয়তো তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করা দুষ্কর হবে। এক যদি রাষ্ট্র সে দায়িত্ব নেয়। রাষ্ট্রও তো জনগণের রাষ্ট্র। তার রুচি তো জনগণেরই রুচি। অথবা জনগণের প্রতিনিধি বলে যাঁরা পরিচয় দেন তাঁদেরই রুচি। থাকতে পারে তাঁদের একটা মহত্তর আদর্শ বা মিশন, কিন্তু লোকে যদি টাকা দিয়ে টিকিট না কাটে সিনেমাও তো হবে একটা রুগ্ণ শিল্প।

ত্রিশ বছর আগে কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চের অবস্থাও ছিল রুগ্ণশিল্পের মতো। শুনেছি অবিভক্ত বঙ্গের শেষ প্রধানমন্ত্রী সুহরাবর্দী সাহেব একটি সৎকার্য করে যান। চারটি থিয়েটারকে অ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্সের হাত থেকে রেহাই দেন। তখনকার মতো তারা বেঁচে যায়। পরে থিয়েটারের আকর্ষণীয়তা বাড়ে। লোকে কেবল সিনেমা দেখে সন্তুষ্ট থাকে না। থিয়েটারে গিয়ে জীবন্ত অভিনয় দেখতে চায়। কিন্তু সেইসঙ্গে আশা করে নানারকম তুকতাক কলাকৌশল। মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত, ধ্বনিবিস্তার, আরামপ্রদ আসন। আরো কত কী! ভদ্রঘরের অভিনেত্রীরা এসে আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে দেন। তাঁদের উন্নততর স্বাচ্ছন্দ্যের মান রক্ষা করতে গিয়ে প্রযোজনার ব্যয়ও আরো বেড়ে যায়। বাড়িভাড়া বাড়তে বাড়তে

আকাশ ছোঁয়। থিয়েটার মালিকদের বা সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা তাঁদের এই শিক্ষাই দেয় যে এক একখানা নাটক যদি একবছর বা দু'বছর বা তিনবছর ধরে না চলে তবে লাভের চেয়ে লোকসানই হয় বেশী। কোথায় পাওয়া যায় সেরকম নাটক! শরৎচন্দ্র ভাঙিয়ে আর কতকাল চলবে! এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের মালিক ও কর্মীরা নাজেহাল। নাচ গান আগেও ছিল, কিন্তু ক্যাবারে ছিল না। তাকে নাটকের মাঝখানে অকারণে আমদানি করতে হলো। যাঁরা নাটকের টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকলেন তাঁরা সেই খরচে ক্যাবারের আনন্দও পেলেন।

এমনি করে এগোতে এগোতে যেখানে এসে পৌঁছনো গেল তার নাম রাখা হয়েছে অপসংস্কৃতি। এটা সংস্কৃত সাহিত্য থেকে নেওয়া নাম নয়। অথবা নয় বিদেশী ভাষা থেকে নেওয়া নামান্তর। ইংরেজী কালচার শব্দের পূর্বে অমন কোনো উপসর্গ বা বিশেষণ বসানো হয় না। 'অপসংস্কৃতি' হচ্ছে বাঙালীর মস্তিষ্কের অবদান। বাংলা আজ যা ভাবে ভারতের অন্যান্য রাজ্য কাল তাই ভাববে। সুতরাং শব্দটার ভবিষ্যৎ আছে। যদি বস্তুটার ভবিষ্যৎ থাকে। থাকবেই, কারণ থিয়েটার সিনেমায় আয়ব্যয়ের সমতা রাখতে হলে দর্শকদের যোগাতে হবে নাইটক্লাবের আনন্দ। যার প্রধান উপাদান নগ্ন নারীদেহ। সে নারী ভদ্রঘরের হলে তো আরো বেশী উদ্দীপনা। একে একে আসবে চুম্বন আলিঙ্গন থেকে শুরু করে আরো অনেক কিছু। পশ্চিমে ও জাপানে এসেছে বা আসি আসি করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে মঞ্চের আলো নিবে যাবে বা আলো আঁধারি হবে। তা না হলে অভিনয় বস্তুনিষ্ঠ হবে কী করে?

দর্শকদের আকর্ষণ করে একদিক থেকে যেমন যৌন আবেদন তেমনি আরেক দিক থেকে হত্যাবিভীষিকা বা আতঙ্কে রোমহর্ষণ। ডিটেকটিভ নভেল বা হরর কমিক্স যা আরো সস্তায় যোগায়।

পশ্চিমে বড়ো বড়ো লেখকরাও বেনামীতে খুনখারাপির 'উপাখ্যান লেখেন। পড়েন যাঁরা তাঁরাও স্বনামধন্য। শ্রীযুক্তা দেবী চৌধুরানী যখন শুতে যেতেন তখন তাঁর সুনিদ্রার সহায় হতো বিলিতী ডিটেকটিভ নভেল। তার বিষয়বস্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নয়। 'ঈশ্বর কে' নয়, 'হত্যাকারী কে'? আজকাল পশ্চিম দেশে ডিটেকটিভ নাটকও হয়েছে। আমাদের এক বন্ধু এ দেশেও তার সূত্রপাত করেছিলেন, কতদূর সফল হলেন বলতে পারব না। ওদিকে আগাথা ক্রিস্টির 'মাউসট্র্যাপ' তো বিশ বছরের উপর সমানে চলছে বা চলেছিল। বিভীষিকা নিয়ে বেসাতিকে অপসংস্কৃতি না বলে কী বলা উচিত?

বিলেতের এক প্রকাশক বছরকয়েক আগে 'নিউ স্টেটসম্যান' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর বক্তব্যের মর্ম হলো, আজকাল প্রকাশনের ব্যয় এত বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে যে দশ হাজার কপি না ছাপলে খরচ পোষায় না। ক'খানা উপন্যাস আছে যার ক্রেতার সংখ্যা দশ হাজার? উপন্যাস লেখা তো উঠেই যাবে, যদি না প্রকাশকদের পরামর্শে লেখকরা কথায় কথায় যৌন প্রেরণার অবতারণা করেন। এসব উপন্যাস আগেকার দিনের প্রেমের উপন্যাস নয়। খোলাখুলি কামের উপন্যাস। কী করা যায়? প্রকাশক তো আর লোকসানের কারবার করতে পারেন না। বহু প্রকাশক এখন উপন্যাস ছেড়ে ইতিহাস, জীবনী, প্রবন্ধ পছন্দ করেন। দেখা যাচ্ছে লোকসান দিতে হয় না। দশ হাজার কপি বিকোয়।

অপসংস্কৃতি ছাড়া আরো একটা সংস্কৃতি আছে, সেটা না থাকলে সব বিলিতী প্রকাশকই সব ঔপন্যাসিককে সেই পরামর্শ দিতেন। নতুবা বইয়ের ব্যবসা তুলে দিয়ে পোশাকের ব্যবসা করতেন। এদেশের প্রকাশকদের সামনে একই সমস্যা। প্রকাশনের খরচ যে হারে বেড়ে যাচ্ছে হাজার পাঁচেক কপি না ছাপলে লাভ তেমন হয় না। অগত্যা গরম মসলা মেশাতে হয়। বাঙালীর পারিবারিক বা

সামাজিক জীবনে ও জিনিস আদৌ ছিল না একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। এখন যে অতিমাত্রায় বেড়ে গেছে তাও নয়। অথচ আজকের দিনের বাংলা কথাসাহিত্যের মোদ্দা কথাটাই তো হলো ওই। তা নইলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। তার জন্যে লিখতে হয় আরেক রকম উপন্যাস। সেটা অপসংস্কৃতি নয়, আরেক রকম সংস্কৃতি। বই বিকোয়, প্রকাশনের খরচা পোষায়, পাঠক-পাঠিকার চরিত্রহানি হয় না, লেখকের ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ লাভ হয়। চতুর্বর্গ নয়, ত্রিবর্গ ফল। মাঝখান থেকে বিপন্ন হয়েছে সত্যিকার সংস্কৃতি। যেসব গ্রন্থের পাঠক সংখ্যা কম বলে প্রকাশক মেলা ভার।

এখানে বলে রাখি যে অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতি একার্থক নয়। অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আইন অনুসারে ব্যবস্থা করতে পারা যায়। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এখনপর্যন্ত কোথাও কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি। তার সংজ্ঞা যে কী তাও নির্ধারিত হয়নি। কিছুদিন আগে একখানি নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে অপসংস্কৃতির অভিযোগ ওঠে। অভিযোগটা আইনগ্রাহ্য নয়। সেটাকে আইনের আমলে আনতে হলে সোজাসুজি নালিশ করতে হতো যে বইখানা অশ্লীল বা যেভাবে তার অভিনয় হচ্ছে সেটা অশ্লীল বা অশালীন। আগেকার দিনে নাট্যাভিনয়ের উপর কড়া সেনসরশিপ ছিল। বইখানা হয়তো আপত্তিকর নয়, অথচ তার অভিনয় পুলিসের মতে আপত্তিকর। পুলিসের লোক তার আপত্তিকর অংশগুলি কেটে কুটে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করত। কলকাতায় তো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নেই, পুলিস কমিশনারই জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাভোগী। একবার আমার কাছে একখানি নাটক হাজির করা হয়। কাটাকুটি দেখে আমি তো হেসেই কুটিকুটি। পুলিসের রসবোধ আমার রসবোধ নয়। আমি কী করি! পুলিসকে একেবারে অপ্রতিভ করা যায় না। ওরা যা করেছে রাজশক্তির মুখ চেয়ে করেছে। সাহিত্যের মুখ চেয়ে

নয়। আর আমিও তো তাই করতুম, যদি না সাহিত্যিক বলে পরিচয় দিতুম। আমাকে তাই আপস করতে হলো। কে জানে হয়তো টিকটিকিরা লাগাত যে আমিও প্রচ্ছন্ন রাজদ্রোহী।

স্বাধীনতার পরে চাকরির ধড়াচূড়া খুলে ফেলার পর নাট্যাভিনয়ের বিরুদ্ধে অন্যান্যদের মতো আমিও দু'কথা বলি বা লিখি। ফলে নাট্যাভিনয়ের উপর সেকালের মতো সেনসরশিপ উঠে যায়। অন্তত আমার তো সেইরূপ ধারণা। আগেকার দিনের ধারা অব্যাহত থাকলে পুলিস কমিশনারই উক্ত নাট্যাভিনয়ের আপত্তিকর দৃশ্য বা শ্রাব্য ছাঁটাই করতেন। যদি তাঁর কাছে সেই মর্মে রিপোর্ট যেত। আমার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা নেই, তাই জোর করে বলতে পারছিনে যে নাট্যপ্রযোজক নিরঙ্কুশ ও পুলিস কমিশনার ঠুঁটো জগন্নাথ। কিন্তু অবস্থা যদি সত্যিই সেরকম হয়ে থাকে তবে আবার সেই পুরোনো আইন ফিরে আসতে পারে। পুলিসের ছাড়পত্র না নিয়ে কিছুই মঞ্চস্থ করতে পারা যাবে না। জনমত যদি সরকারী হস্তক্ষেপ চায় তো সরকারী স্থূল হস্তাবলেপই আছে নাট্যপ্রযোজকের কপালে। নাটকটির কথা আলাদা। এখন পর্যন্ত কেউ বলেনি যে নাটকটি অশ্লীল।

আমার এক বন্ধু ওই নাটকটির অভিনয় দেখেছেন তিন বার। তাঁর মুখে শুনেছি প্রথমবারের অভিনয় নির্দোষ ছিল। পরিবারের সবাইকে নিয়ে দেখতে পারা যেত। কিন্তু দ্বিতীয়বারে অভিনয়ে আবিলতা প্রবেশ করে। সবাইকে নিয়ে দেখতে পারা যায় না। তৃতীয়বার তিনি সবাইকে নিয়ে নয়, স্ত্রীকে নিয়ে দেখতে যান। দেখেন দস্তুরমতো বেলেল্লাপনা। এই অধোগতির কারণ কী হতে পারে ? অভিনেতারা ভদ্রসন্তান। অভিনেত্রীরাও আজকাল ভদ্রঘরের কন্যা বা বধূ। কার সেবা করছেন এঁরা ? আর্টের সেবা নয় নিশ্চয়। এর ইংরেজী নাম আর্ট নয়, পর্নোগ্রাফী। আমরা যারা আর্টের সেবায় নিবেদিত তারা পর্নোগ্রাফীর পক্ষ নিয়ে লড়তে পারব না।

আর্ট কোথায় শেষ হয়েছে আর পর্নোগ্রাফী কোথায় শুরু হয়েছে তার সীমানা নির্দেশ করা সহজ নয়। একদা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছিলেন তাঁরই বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল। বইখানা রবীন্দ্রনাথ শুধরে দেননি, সেটা এখনো সেইরকম আছে। কিন্তু সেটাকে যখন নৃত্যনাট্যরূপ দেন তখন আমি অবাক হয়ে দেখি শেষদৃশ্যে অর্জুন চিত্রাঙ্গদার বিবাহ। দুষ্যন্ত শকুন্তলার মতো গান্ধর্ব বিবাহ নয়, শাঁখ বাজিয়ে সকলের সামনে আনুষ্ঠানিক বিবাহ। কবিকে ধন্যবাদ যে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালকে খুশি করার জন্যে বইখানার উপর অঙ্কুশ চালাননি। কিন্তু এ যা করেছেন এটা আর্টের খাতিরে নয়। এটা বালিকাদের অভিভাবকদের মুখ চেয়ে।

এটা হলো চল্লিশ বছর আগেকার কথা। এই চল্লিশ বছরে সমাজের মূল্যবোধ কি সম্পূর্ণ উলটে গেছে? তখনকার দিনে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে ভদ্রমহিলাদের পাওয়া যেত না। সতীদের ভূমিকায় অভিনয় করতেন পতিতারা। এখন পতিতাদের বা ব্যভিচারিণীদের ভূমিকায় অভিনয় করেন সতীরা। দ্বিজেন্দ্রলাল বেঁচে থাকলে মূর্ছা যেতেন, রবীন্দ্রনাথ বলতেন, "মা ধরণী—"। আমি কিন্তু এর মধ্যে কোনো অন্যায় দেখিনে। যে ভূমিকায় যার মানায় সে ভূমিকায় সে অভিনয় করবে। অভিনেতাদের বেলা কি আমরা এই বলে দোষ ধরি যে সন্ন্যাসীর ভূমিকায় নেমেছে নামকরা লম্পট মাতাল? বা শয়তানের ভূমিকায় সত্যিকার সজ্জন? অভিনয় দেখে বোঝবার উপায় নেই আসলে কে কী রকম।

নাটকের পাঠ থেকে যেমন মন্দ চরিত্রদের বর্জন করতে পারা যাবে না তার অভিনয় থেকেও তেমনি ভদ্রঘরের নরনারীদের বহিষ্কার করতে পারা যাবে না। করা উচিতও নয়। অভিনয়ের উৎকর্ষই এক্ষেত্রে একমাত্র মাপকাঠি। পশ্চিমে কেউ কারো প্রাইভেট লাইফ

নিয়ে মাথা ঘামায় না। অভিনয় দেখতে এসেছ, ছাখ। ভালো না লাগে তো এসে না। সিনেমায় এদেশেও সেটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। থিয়েটারেও হবে। সতীরাই কেবল সতীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন, পতিতারাই কেবল পতিতার ভূমিকায় বা ব্যভিচারিণীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন, দুর্জনরাই কেবল দুর্জনের ভূমিকায় অভিনয় করবে, সুজনরাই কেবল সুজনের ভূমিকায় অভিনয় করবে, এরূপ বিধান ভারতনাট্যশাস্ত্রে বা অন্য কোনো শাস্ত্রে নেই। থাকতে পারে না। কারণ অভিনয়ের অর্থই হচ্ছে যা নয় তাই। বৃদ্ধ বয়সেও সারা বার্নার্ড সাজতেন কিশোরী জুলিয়েট। রোমিওটি হয়তো নাতির বয়সী। নটী বিনোদিনী সাজতেন চৈতন্যদেব। শিশির ভাদুড়ী সাজতেন আলমগীর। রবীন্দ্রনাথ সাজতেন অন্ধ বাউল। খুঁত ধরতে হলে ধরতে হয় তাঁদের অভিনয়ের বা সাজসজ্জার। প্রাইভেট লাইফ এক্ষেত্রে অবান্তর।

মঞ্চের তেমনি কতকগুলো কনভেনশন আছে। জীবনে যা দেখা যায় রঙ্গমঞ্চে তা দেখানো সম্ভব নাও হতে পারে, সম্ভব হলেও সঙ্গত নাও হতে পারে। নাটকে হয়তো চলে, কিন্তু নাট্যাভিনয়ে অচল। তবে কনভেনশনও দেশ অনুসারে কাল অনুসারে ভিন্ন। সিনেমা নামক 'শিল্প'টি এক শতাব্দী পূর্বেও ছিল না। সিনেমার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে থিয়েটারও তার অনুকরণ করতে বাধ্য হয়েছে। এখন তো টেলিভিসন বলে আরো এক 'শিল্প' এসে উপস্থিত। শুনতে পাই আমেরিকায় বড় কেউ সিনেমা দেখতে যায় না। যে যার ঘরে বসে টেলিভিসন দেখে। থিয়েটারেরও হয়তো সেই দশা হবে। সেটা এড়ানোর জন্যে থিয়েটার যদি নাইট ক্লাবের অনুকরণ করে তা হলে কী করেই বা তাকে বলি, "থিয়েটার, তুমি আত্মরক্ষা কোরো না। তুমি তোমার আত্মাকে রক্ষা করো।" এ সমস্যার সমাধান এত কঠিন যে রাষ্ট্র থেকে অনুদান দিয়েও এর সুরাহা হবে না।

রাষ্ট্রায়ত্ত থিয়েটারও এ প্রশ্নের সদুত্তর নয়। থিয়েটারকে আকর্ষণীয় করতে হবে, অথচ বেলেল্লাপনা দিয়ে নয়। বিভীষিকা দিয়ে নয়। সেটা সুনিশ্চিতভাবেই অপসংস্কৃতি।

আমার এক বন্ধুর বিশ্বাস ধনতন্ত্রই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। গোড়ায় কোপ দাও, তা হলে দেখবে অপসংস্কৃতিও হাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু সাধারণ লোকের রুচির উন্নতি না হলে সমাজতন্ত্রও কি সাধারণকে কেবল শ্রেণীসংগ্রামের মন্ত্র পড়িয়ে শান্ত করতে পারবে? রুচির দিক থেকে তারা যে তিমিরে তারা সেই তিমিরে। সব কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত করে অপসংস্কৃতি রোধ করা সম্ভব, কিন্তু সংস্কৃতির প্রবেশপথ কি একই কালে রুদ্ধ হবে না? নাচ গান বাজনায় নরনারীর চরিত্রহানি ঘটতে দেখে ইসলাম নাচ গান বাজনা বন্ধ করে দেয়। চরিত্র হয়তো রক্ষা পেলো, কিন্তু নৃত্যগীতবাদ্যের চর্চাও হলো না।

আগেকার দিনে ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতা না হলে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতসাধনা সম্ভব হতো না। দুর্গোৎসবও ছিল ধনীদের প্রসাদনির্ভর। থিয়েটারও তো ধনীরই দৌলতে আরম্ভ হয়। সব দেশেই এই ইতিহাস। ব্যালে কিংবা অপেরার পেছনে যে জীবনব্যাপী সাধনা সে সাধনার পেছনে অভিজাতদের মুক্ত হস্তে অর্থব্যয়। সেই শ্রেণীটাই লোপ পেয়ে গেছে বা যাচ্ছে। সুতরাং অপর এক শ্রেণীর উপরেই বর্তেছে বা বর্তাচ্ছে এখন সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা। অপর শ্রেণীটি আপাতত বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইতিহাসের মঞ্চ থেকে এরও বিদায় ঘটবে। তখন এ দায় যাদের বহন করতে হবে তারা অন্য একটি শ্রেণী। তাদের বলা হয় প্রোলিটারিয়ান। বিপ্লবের জন্যে যারা অধীর নয় তারাও উপলব্ধি করছে যে অঙ্কস্য বামা গতিঃ। ইতিহাসও তেমনি বামদিকে গতিশীল। ইতিমধ্যেই আমরা বামপন্থীদের ভোট দিয়ে মঞ্চে বসিয়ে দিয়েছি।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে গণতন্ত্রও সাধারণ লোকের ইচ্ছানির্ভর। ধনীদের প্রতাপ চিরন্তন নয়। লোকে যখন আরো সচেতন হবে তখন ধনীদের খুশিমতো নয়, নিজেদের খুশিমতো ভোট দেবে। তখন তারা যদি ধনতন্ত্রকে সামন্ততন্ত্রের মতো উচ্ছেদ করতে চায় সেটাও সম্ভব।

কিন্তু সংস্কৃতি কি তার নিজের দমে চলে না পরের দেওয়া দমে? একজন হোমার কি বাল্মীকি, কালিদাস কি দান্তে, শেক্সপীয়ার কী লেওনার্দো, নিউটন কি বেঠোভেন, টলস্টয় কি রবীন্দ্রনাথ কি এঁর ওঁর তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার জন্যেই অমর? না এঁদের অমরত্বের মূলে আর কোনো শক্তি সক্রিয়? প্রোলিটারিয়ানদের হাতে ক্ষমতা আসার পর অর্ধ শতাব্দী অতীত হয়েছে। কই, ক'জন শিল্পীকে তারা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে মহান করে দিতে পেরেছে? নতুন নতুন আর্ট ফর্মই বা কোথায়? অভিজাত যুগের উত্তরাধিকার বাদ দিলে তাদের স্বোপার্জিত সাংস্কৃতিক সম্পদ কী পরিমাণ? বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির অপপ্রচার থেকে মুক্ত হয়ে ওরা হয়তো বেঁচে গেছে, কিন্তু ওদের বংশধরদের জন্যে রেখে যাচ্ছে কোন্ সংস্কৃতির উত্তরাধিকার? আমাদের এদেশে তো প্রোলিটারিয়ান কালচারের রূপরেখার আভাসটুকুও পাচ্ছিনে। শ্রেণীবিদ্বেষ বা পরনিন্দার উপর একটা স্বনির্ভর কালচার গড়ে উঠতে পারে না। ধ্বংসের অধিকার তারই জন্মায় যে সৃষ্টির সাধনায় তৎপর। কোথায় সেই সৃষ্টির সাধনা যাকে 'পীপলস্' বলে চিহ্নিত করতে পারি? চোখে যেটা পড়ে, কানে যেটা আসে সেটা পপুলার বা ভালগার। জনতাও তার জন্যে কম দায়ী নয়, কারণ জনতাই বাজে সিনেমার, বাজে থিয়েটারের, বাজে যাত্রার টিকিটের জন্যে ভিড় করে। সুসংস্কৃতির জন্যে দাম দিচ্ছে কারা?

সুসংস্কৃতির উপভোক্তা সর্বসাধারণ, কিন্তু স্রষ্টা শতকরা একজনেরও কম। সেই ক'জনের উপর দৃষ্টিপাত না করে কেবল যদি অপসংস্কৃতির

অপস্রষ্টাদের নিয়ে রাজ্য তোলপাড় করা হয় তবে যথাস্থানে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। গুরুত্ব দেওয়া হয় অস্থানে বা কুস্থানে। এতে তাদের বিজ্ঞাপনের কাজও হয়ে যায় বিনা খরচায়। অথচ তাদের শাস্তি দেবার মতো মনের জোরও নেই। দিলে প্রভাবশালী মহলে অপ্রিয় হতে হয়। জনমত ওভাবে তৈরি হতে পারে না। অপসংস্কৃতির সংজ্ঞা কী, নমুনা কী, সেটা কেন বর্জনীয়, কেন দণ্ডনীয় এসব খুলে বলতে হবে, তা শুনে প্রতিপক্ষও আত্মসমর্থন করতে পারে। প্রতিপক্ষের বক্তব্যও শ্রবণ করতে হবে, খণ্ডন করতে হবে। এর জন্যে চাই একটা তর্কসভা বা সেমিনার, যাতে যোগ দেবার জন্যে বিভিন্ন মতের বুদ্ধিজীবীদের আমন্ত্রণ করতে হবে। কেবল একপক্ষের অভিযোক্তাদের নয়। আমার তো মনে হয় অভিযুক্তদের আহ্বান করা উচিত। তাদের বক্তব্যও প্রণিধান করা উচিত।

অপসংস্কৃতির পক্ষপাতী আমরা কেউই নই। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা তার বিনাশের জন্যে যে অস্ত্রটি শাণিত হচ্ছে সেটি একদিন আমাদের ঘাড়েও পড়বে। কারণ আমরাও তো জীবনের সব দিক দেখাতে গিয়ে কায়িক দিকটিও দেখাচ্ছি। মানুষের যেমন মন আছে, প্রাণ আছে, আত্মা আছে, তেমনি দেহ আছে, দেহের কামনা বাসনা আছে, দেহের আনন্দ বেদনা আছে। পূর্ণ সত্য প্রকাশ করতে চাইলে একটা দিক সম্পূর্ণ ঢেকে রাখা চলে না। এটা ব্যবসাদারি নয়, এর পেছনে অর্থকরী মনোভাব নেই, এটা বুর্জোয়াশ্রেণীতে জন্মানোর জন্যেও নয়। এটা একটা করণীয় কাজ। শ্রমিকশ্রেণীতে যাঁদের জন্ম তাঁরাও এ কাজ একদিন করবেন। তখন তাঁদের ঘাড়ে খাঁড়া নেমে আসতে পারে। খাঁড়া জিনিসটাই বিপজ্জনক। সেটাকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দেওয়া কারো পক্ষ নিরাপদ নয়।

পতিতারাও নারী। তারাও মানুষ। তাদের সুখদুঃখের কথা সাহিত্যে থাকবে না তো কোথায় থাকবে? কী জ্বলন্ত বিবেকের

সঙ্গে লেখা টলস্টয়ের মহৎ উপন্যাস 'রেসারেকশন'! ডস্টয়েভস্কির 'কারামাজভ ভ্রাতৃগণ'-এ কী গভীর দরদের সঙ্গে আঁকা গ্রুশেঙ্কা, যে দণ্ডিত অপরাধীর সঙ্গে সাইবেরিয়ায় যায়। বাংলাসাহিত্য এখনো ওদের নিয়ে সেন্টিমেণ্টালিটির উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। তবু সেও ভালো। যেটা ভালো নয় সেটা খদ্দের পাকড়াবার জন্যে থিয়েটারে বেলেল্লাপনা। সেটাও একপ্রকার পতিতাবৃত্তি। কৌতূহলী জনতাই সেটার পৃষ্ঠপোষক। অভিজাতরা নন। সংস্কৃতিমান মধ্যবিত্তরাও নন।

উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সারাজীবনের সাধনা। ভারতের ইতিহাসে গণিকা ও দেবদাসীরাই এযাবৎকাল তার দায় দায়িত্ব বহন করে এসেছে। কুলবধূদের তার জন্যে সময়ও ছিল না, সুযোগও ছিল না, হয়তো অভিরুচিও ছিল না। ইদানীং বহুক্ষেত্রে অভিরুচির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, কেবল বালিকাবয়সে নয়, বিবাহের পরেও। বহুক্ষেত্রে সুযোগও পাওয়া যাচ্ছে, সমাজ অনেক বেশী উদার হয়েছে। কিন্তু সাধনার উপযুক্ত সময় দিতে পারে ক'জন? সন্তান হলে তার দায় দায়িত্ব নেবে কে? উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের শিক্ষা বহুজন আরম্ভ করে দিলেও এক আধজনই জীবনভর অবিরাম চালিয়ে যেতে পারে। যদি অর্থাভাব না থাকে। পশ্চিম দেশে কনসার্টের ব্যবস্থা আছে। সেটাই সঙ্গীতসাধিকাদের জীবিকা। কনসার্ট হলে কনসার্ট হয়। হয়তো একজনের বেহালাবাদন বা কণ্ঠসংগীত। শ্রোতারা টিকিট কাটে। সেইভাবে অর্থোপার্জন চলে। ধনী পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজন হয় না। ধনতন্ত্রকে এর মধ্যে টেনে আনার দরকার দেখিনে। এরা কেউ গণিকা নন, রক্ষিতা নন, সমাজের চোখে হেয় নন। আজকাল অর্কেস্ট্রাতে মহিলাদের বেহালা কিংবা চেলো বাজাতে দেওয়া হয়। এক এক করে সব দুয়ার খুলে যাচ্ছে। এ যুগটা কেবল শূদ্র জাগরণের যুগ নয়, নারীজাগরণেরও যুগ। বিশ্বময়।

একটু আগেই বলেছি যে, সুসংস্কৃতির উপভোক্তা সর্বসাধারণ,

কিন্তু স্রষ্টা শতকরা একজনেরও কম। এঁদের যদি পৈত্রিক বিত্ত না থাকে, যদি স্বোপার্জনের সুযোগ বা অবকাশ না থাকে তবে এঁদের সাধনা শুরু হতে না হতে অকালে সাঙ্গ হবে। প্রায়ই তো দেখতে পাই যিনি হতে পারতেন সার্থক কবি তিনি হয়েছেন চলনসই উকীল। কালেভদ্রে দুটো একটা কবিতা লিখে নিয়মিত সাধনার ফল লাভ হয় না। সঙ্গীতে নৃত্যে অভিনয়ে চিত্রকলায় ভাস্কর্যে সর্বত্র প্রথম প্রতিশ্রুতির দীপ্তি। তারপর লাইনচ্যুত হয়ে কেউ হয় ডাক্তার, কেউ হয় মাস্টার, কেউ হয় ঠিকাদার, কেউ করে গিন্নীপনা। রাজসভার বা দেবমন্দিরের বা মঠবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতা আর নেই। থাকতে পারত এনডাউমেনটের বা ফাউণ্ডেশনের অর্থানুকূল্য। যদি সংস্কৃতির প্রতি ধনিকদের দায়িত্ববোধ থাকত। যেমন আছে ধর্মের প্রতি। এদিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে আমরা শুধু সরকারের দুয়ারেই ধরনা দিচ্ছি। আর ভাবছি সমাজতন্ত্রী সরকার কায়েম হলেই গুণীজনের গুণের আদর হবে আর গুণীজন অব্যাহতভাবে তাঁদের মনোনীত কলাবিদ্যার চর্চা করবেন। তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা তাঁদের নিয়তি নিয়ন্ত্রিত হবে না। ভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য কথা বলে।

অপসংস্কৃতির পক্ষে একটা জোরালো যুক্তি এই যে, ময়রার দোকানের মতো সে স্বাবলম্বী। সরকারের সাহায্যের জন্যে সে হাত পাতে না। তার খুঁটির জোর জনতার আগ্রহ। আর এটাও একটা পরীক্ষিত সত্য যে জনতার আগ্রহ একদিনে বা একমাসে বা এক বছরেও ফুরোয় না। কোটি কোটি মানুষ যদি একই নাটকে আগ্রহী হয় তো একটানা দশ বিশ বছর ওই নাটকই বাজার মাত করতে পারে। ততদিনে সরকার বদল বিচিত্র নয়। অপসংস্কৃতির বিপক্ষে যাঁরা আসরে নেমেছেন ততদিনে তাঁদেরও গলার জোর ক্ষীণ হয়ে থাকবে, কলমের নিব ভোঁতা হয়ে থাকবে। অপসংস্কৃতি যে টিকে

থাকবে তার নিশ্চয়তা কোন্‌খানে? নিশ্চয়তা স্বাবলম্বনে। আর স্বাবলম্বনের স্থিরতাই বা কোথায়? স্থিরতা জনতার রুচিতে।

জনতার রুচি পরিবর্তনের কঠিন কাজে কি কারো উৎসাহ আছে? অধ্যবসায় আছে? যদি কারো থাকে তবে তিনিই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন। ছেলেবেলায় আমাকে মিষ্টি কিনতে দেওয়া হতো না এই বলে যে, বিবেকানন্দ বলেছেন ময়রার দোকান বিষ। মিষ্টি খাওয়া যদি আমি বন্ধ করে থাকি তো ছেলেবেলায় পয়সার অভাবে ও বড়ো হয়ে বহুমূত্রের ভয়ে। বিবেকানন্দের উপদেশে নয়। বিতর্কিত নাটক দেখতে যারা যাচ্ছে না তাদের হয় পয়সার অভাব, নয় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যাবার ভয়। ওইটুকু চক্ষুলজ্জা এখনো আছে। তা বলে ছেলেমেয়েরা যে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে না তা নয়। ইংরেজী 'এ' চিহ্নিত ফিল্ম দেখতে ভিড় করে নাবালক নাবালিকারাও কম নয়। বাপ মার অজান্‌তে।

ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে দীর্ঘকাল তর্ক করার পর এখন এ বয়সে আমি আর ওর বিপক্ষে তর্ক করতে পারিনে। সে ইচ্ছাই আমার নেই। আমি শুধু মনে করিয়ে দেব যে, স্বাধীনতা মানে দায়িত্বহীনতা নয়। স্বাধীনতার অপব্যবহার পরাধীনতা ডেকে আনে। বাচ্চারা যদি দুধ খেতে না পায় তো বুড়োদের রসগোল্লা খাওয়ানোর স্বাধীনতায় সরকারী হস্তক্ষেপ অনিবার্য হবে। তখন ময়রার দোকান তেমন অর্থকরী হবে কি? অনেক দোকানই উঠে যাবে। একই দশা ঘটতে পারে সিনেমার, থিয়েটারের, যাত্রার, যদি দেশের যারা ভবিষ্যৎ তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়। অপসংস্কৃতির কর্ণধারদের কর্ণমর্দন আসন্ন না হলেও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুসংস্কৃতির সত্র খুলে দিতে হবে। ভুলে যেতে হবে কার কী মতবাদ, কে কোন্‌ পার্টির সদস্য। মনে রাখতে হবে কার কী সাধনা ও কার কী সাধ্য।

প্রশাসনে বাংলাভাষার ব্যবহার

প্রশাসনে বাংলাভাষার ব্যবহার নতুন কিছু নয়। ইংরেজ আমলেও সরকারী কাজকর্ম বহুপরিমাণে বাংলাভাষায় হতো। তাই যদি না হতো তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে হলহেড সাহেব তাঁর বাংলাভাষার ব্যাকরণ লিখলেন কেন? লেখা হয়েছিল সেটা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেব কর্মচারীদের সরকারী কাজকর্মের সুবিধার জন্যে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখানোর জন্যে বাংলায় বই লেখার দরকারটা কী ছিল, যদি সরকারী কাজকর্মের কোনোখানেই বাংলার স্থান না থাকত?

গ্রামপ্রধান দেশে গ্রামের জনসাধারণের সরকারের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল দুটি। একটি আইন ও শৃঙ্খলা। অপরটি রাজস্ব। রাজস্ব জমিদাররাই যোগাতেন, রায়তদের সঙ্গে সরকারের সরাসরি সম্পর্ক ছিল না, যদি না তারা হতো সরকারী খাসমহলের রায়ত। জমিদারি ও খাসমহলের সেরেস্তার কাজকর্ম বাংলাতেই চলত। এর জন্যে সাহেবদেরই শিখতে হতো বাংলা।

গ্রাম অঞ্চলে আইন ও শৃঙ্খলা বলতে বোঝাত পুলিস আর চৌকিদার দফাদার। পুলিসের কনস্টেবলদের বিদ্যা অতি সামান্য। না থাকলেও ক্ষতি ছিল না। আর চৌকিদার দফাদার তো নিরক্ষর। যারা একটু লেখাপড়া জানত তাদের বলা হতো লিটারেট কনস্টেবল। দারোগা বা জমাদার থানায় উপস্থিত না থাকলে সংবাদদাতার ডায়েরি লিখত লিটারেট কনস্টেবল। বাংলাতেই। আর দারোগা বা জমাদার উপস্থিত থাকলে পুলিসের ধর্তব্য অপরাধের এজাহার লিখে নিতেন তাঁরাই। সাধারণত বাংলাতেই। ইংরেজীর ব্যবহার ছিল ক্ষেত্রবিশেষে।

অপরাধ যদি পুলিসের ধর্তব্য না হয় তবে ফরিয়াদী যেত, মহকুমা হাকিমের আদালতে। বাংলায় দরখাস্ত পেশ করত। তিনি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইংরেজীতে মর্ম লিখে নিতেন। স্থানীয় তদন্তের জন্যে যাঁদের কাছে পাঠাতেন তাঁরা বাংলাতেই রিপোর্ট দিতেন। সাক্ষী দিতে যারা আসত তারা বাংলাতেই জবানবন্দী দিত, হাকিম লিখে নিতেন ইংরেজীতে। সেটা পেশকার সাক্ষীকে বাংলায় তর্জমা করে শোনাতেন। আসামীর উক্তি হাকিম বাংলাতেই· লিখে নিয়ে আসামীকে পড়ে শোনাতেন। যে কোনো একটা মামলায় নথি খুললে দেখা যাবে বাংলার ব্যবহার বড়ো কম নয়। বাংলাই ছিল আদালতের ভাষা। জজ কোর্টেও সাক্ষী ও আসামীরা বাংলায় বলত। জজ যখন জুরিকে চার্জ দিতেন তখন বাংলাতেই বলতেন, না পারলে পেশকার করতেন তর্জমা।

রাজস্ব আদায় আর আইন-শৃঙ্খলারক্ষা এই দুটি বিভাগই ছিল মূল বিভাগ। কালক্রমে বিভাগের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কলেকটর ও ম্যাজিস্ট্রেট হলেন একই ব্যক্তি। জেলা ও দায়রা জজ হলেন অপরজন। একে একে এসে হাজির হলেন সিভিল সার্জন, পি-ডব্লিউ-ডি'র ইঞ্জিনীয়ার, ইরিগেশনের ইঞ্জিনীয়ার, কলেজের প্রিন্সিপাল, জেল সুপারিনটেনডেন্ট, ফরেস্ট অফিসার প্রভৃতি বিভাগীয় প্রধান। এঁরা ইংরেজ না হলেও ইংরেজীনবীশ। এঁদের বিভাগগুলিতে বাংলায় কাজ করা শক্ত। পরিভাষিক শব্দ এঁরা পাবেন কোথায়? আগেকার আমলে ফারসী দিয়ে রাজস্ব আদায় ও আইন-শৃঙ্খলার কাজ চলত, তার থেকে পারিভাষিক শব্দ নিয়ে কাচারি ও আদালতের ব্যবহারযোগ্য বাংলাভাষাও হাতের কাছে জুটত। কিন্তু একজন সিভিল সার্জনকে যদি বলা হতো পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বা ধর্ষিতা নারীর মেডিকাল এগজামিনেশন রিপোর্ট পাঠাতে তিনি কোথায় পেতেন বাংলা পারিভাষিক শব্দ? ফারসী সেক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য

করত না। করতে পারত সংস্কৃত। কিন্তু সার্জারির প্রয়োজন প্রচলিত সংস্কৃতভাষার সীমানার বাইরে। একই কথা প্রযোজ্য ইঞ্জিনীয়ারিং বা অ্যাকাউন্টিং-এর বেলায়।

দেশ যতই আধুনিক যুগের দিকে অগ্রসর হয়, যতই বিজ্ঞানের প্রভাবে আসে ততই ইংরেজীর শরণ নিতে বাধ্য হয়। ইংরেজের রাজত্ব না হয়ে কংগ্রেসের রাজত্ব হলেও নতুন নতুন বিভাগের চাপে ফারসী কোণঠাসা, সংস্কৃত অচলিত, বাংলা অর্বাচীন। কাজ চালাতে হলে ইংরেজীর দ্বারস্থ না হয়ে উপায় নেই। পারিভাষিক শব্দ নির্বাচনের বা নির্মাণের ভার যাঁদের উপর দেওয়া হয় তাঁরা ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার বা অ্যাকাউনট্যাণ্ট নন। তাঁদের দৌড় ওই পুরাতন সংস্কৃত অভিধান পর্যন্ত। মোল্লার দৌড় যেমন মসজিদ অবধি। পুরাতন সংস্কৃত অভিধান যাঁদের জন্যে প্রণীত হয়েছিল তাঁরা এ যুগের লোক ছিলেন না। তাঁদের কাছ থেকে শব্দ ধার করে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া যায় না, আকাশ পারাপার করা যায় না। যুদ্ধ জেতা যায় না। ব্যবসায় চালানো যায় না। সরকারী কাজ কি এসব কাজের চেয়ে কম কঠিন?

পারিভাষিক শব্দ ইংরেজী থেকেই নিতে হবে, যেখানেই দরকার, যখনি দরকার। ইংরেজদের মন্ত্র ছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কনভিনিয়েন্স। আমাদেরও মন্ত্র প্রশাসনিক সুবিধা। সময় বাঁচাতে হবে, শক্তি বাঁচাতে হবে, লোকেরও কিছু প্রত্যক্ষ উপকার করতে হবে। কেনই বা তাদের অভিধান খুলতে বাধ্য করা যাবে? পুলিসের চেয়ে আরক্ষ, কলেক্টরের চেয়ে সমাহর্তা, জজের চেয়ে ন্যায়াধীশ কোন্ গুণে শ্রেয়?

ইংরেজ শাসকরা ইচ্ছা করলে কি মুনসেফ, সেরেস্তাদার, নাজির, তৌজিনবীশ, পোদ্দার, আমিন প্রভৃতি ফারসী শব্দগুলির জায়গায় ইংরেজী শব্দ প্রবর্তন করতে পারতেন না? পারতেন বইকি। কিন্তু তাঁরা ছিলেন কাজের লোক। কাজের সুবিধা অসুবিধা তৌল করে দেখতেন ও সম্ভব হলে স্থিতাবস্থাই সংরক্ষণ করতেন। তাঁদের স্বভাবের

ছিল একপ্রকার সংরক্ষণশীলতা। "আপনার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। তিনি এখন কোথায়?" জিজ্ঞাসা করতেই মেমসাহেব বলেন, "তিনি এখন কাচারিতে।" বলতে পারতেন "অফিসে"। কিন্তু কলেক্টর সাহেবের পক্ষে অফিসের চেয়ে কাচারিই ছিল আরো মর্যাদা-সূচক। নবাবী আমলের মতো। তাঁরাও ছিলেন এক একটি নবাব। নইলে জমিদারদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবেন কেন?

দিনকাল বদলে গেছে। কিন্তু যতই বদলে যাক স্থিতাবস্থার মূল্য আছে। সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে যেটা মর্যাদাসূচক সেটাকে সংরক্ষণ করাই উচিত। তাঁদের একটা ঐতিহ্য আছে। সেটা ইংরেজী আমলের জের। ইংরেজদের বেলা যেমন ছিল মোগল আমলের জের। কলমের এক খোঁচায় তাঁরা বল্লালসেনের যুগে ফিরে যেতে পারবেন না। লোকে ঠাওরাবে তাঁরা ভূঁইফোঁড়।

"মুনসেফ"-কে ইংরেজরা দুশো বছরেও তাড়াতে পারেনি। "ম্যাজিস্ট্রেট"-কে তাড়াতেও কি আরো দুশো বছরের কম সময় লাগবে? একটি ইংরেজী শব্দের জায়গায় একটি বাংলা শব্দ বসাতে হবে, তা নইলে বাংলাভাষা অশুদ্ধ হবে, এ মনোভাব পণ্ডিতদের হলে মানায়, কিন্তু কাজের লোকদের হলে কার্যনাশ। 'এমনিতেই সরকারী কাজকর্মে যথেষ্ট ঢিলেমি। তার উপর যদি প্রত্যেকের উপর হুকুম জারি হয় যে, "সদা স্বদেশী শব্দ ব্যবহার করিবে, কদাপি বিদেশী শব্দ ব্যবহার করিবে না", তা হলে কর্মচারীরা কলম ধরতে ডরাবেন। তার আগে দশবার ভাববেন অমুক ইংরেজী শব্দটার বাংলা পারিভাষিক শব্দ কী।

আমার পরামর্শ হচ্ছে, "সদা বাংলাভাষাতেই লিখিবে, কিন্তু সময় নষ্ট হইতেছে দেখিলে ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ করিবে।" সরকারী কর্মচারীরা তো সাহিত্য সৃষ্টি করছেন না। কেই বা তাঁদের ভাষার বিচার করছে? লোকে চায় কাজ, সময়মতো কাজ। অকর্মাদের

নতুন একটা অজুহাত যেন না হয়, "কী করব, মশাই, আপনার চিঠির জবাব দিতে তিনমাস লাগল উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে। হ্যাঁ, টাকাটা পাবেন ঠিকই, তার আগে তো আমরা বাংলাভাষাটা দোরস্ত করি।"

ভারতচন্দ্রের ভাষা ছিল যাবনীমিশাল। তেমনি প্রশাসনেরও ভাষা হবে ইংরেজীমিশাল।

বাংলা আর ইংরেজী

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষানীতির হেরফের নিয়ে যে বিতর্ক উঠেছে সেই প্রসঙ্গে আমাকেও দু'এক কথা বলতে হয়েছে, কিন্তু যেভাবে আমার মতামত প্রকাশিত হয়েছে তাতে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে। তাই সবিস্তারে লিখছি।

কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীকে যদি প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হয় তবে সে শিক্ষা মাতৃভাষাতেই দিতে হয়। এটাই সব দেশের রীতি। এটাই স্বাভাবিক ও সহজ। এটাতেই সব চেয়ে কম খরচ। অথচ এটাকে ত্রিভাষী সূত্রের আমলে এনে অযথা বিলম্ব হয়েছে। আমার সুস্পষ্ট অভিমত এই যে প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষাতেই দিতে হবে। সর্বসাধারণের জন্যে এ ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা হতে পারে না।

কিন্তু প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সরকার থেকে এরা অনুদান পায় না। চায়ও না। অভিভাবকরাই বর্ধিত হারে বেতন দেন। আসনের জন্যে ছ'মাস বা একবছর আগে থেকে ধর্না দিতে হয়। বাছাইয়ের জন্যে টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়, তাতে পাস করতে হয়। তারও আগে প্রমাণ করতে হয় যে ছেলেমেয়ের বয়স নির্দিষ্ট বয়সের চেয়ে কম নয়। ধরাধরির ব্যাপারও আছে। ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে কেন এত ভিড়? কারণ অভিভাবকরা বদলী হয়ে গেলে যেখানে যাবেন সেখানে ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা অব্যাহত হয়। নয়তো যেখানে যাবেন সেখানকার মাতৃভাষা শেখাতে হবে আগে, তার জন্যে একবছর কি দু'বছর নষ্ট হবে। ফলে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট। যাঁদের বরাত ভালো তাঁদের বদলীর জায়গায় ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয় থাকে। না থাকলে কী হয় তা অনুমেয়। ভারত

সরকার এখন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে হিন্দী মাধ্যম চালাতে চান, যাতে কেউ বলতে না পারেন যে বদলীতে তাঁর পুত্রকন্যার পড়ার ক্ষতি হবে। আমার মতে এটা একপ্রকার জুলুম। হিন্দী তো তাদের মাতৃভাষা নয়।

এ ছাড়া আরেকটা কারণ, যাঁদের বদলীর চাকরি নয় বা যাঁরা চাকুরে নন তাঁদের অভিপ্রায় ইংরেজী মাধ্যমে অভ্যস্ত থাকলে কলেজে ইংরেজী লেকচার বুঝতে ও ইংরেজীতে প্রশ্নপত্রের উত্তর দিতে অসুবিধে হবে না, ফলে নম্বর বেশী উঠবে। প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার ছোট মেয়েকে তার অধ্যাপক বলে রেখেছিলেন যে সে প্রথম শ্রেণী পাবার যোগ্য হলেও প্রথম শ্রেণীতে পাস করবে না, যদি না ইতিমধ্যে ইংরেজীটা ভালো করে শেখে। "এখন থেকে আমি স্থির করেছি যে ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী না হলে ভর্তি করব না, তুমিই শেষজন।" মেয়ের খাতিরে মাকে কলকাতায় বাসা নিয়ে তাকে ইংরেজী পড়াতে হয়। বাপের পেনসনে টান পড়ে। শ্রম ও ব্যয় পরে সার্থক হয়। কিন্তু ক'জনের মা ইংরেজীভাষিণী ও বাপের পেনসন ছাড়া বই থেকে কিছু আয় হয়?

"বিশ্বভারতীর ছেলেমেয়ে আর আমরা নেব না। তুমিই শেষজন।" বলেন তার অধ্যাপক। লেকচার তিনি ইংরেজীতেই দেন, বাংলায় নয়। বইপত্র তো আগাগোড়া ইংরেজী। বিষয়টা জীববিজ্ঞান।

তা বলে আমি বলব না যে ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয় ভিন্ন আর কোনো বিদ্যালয় থাকবে না। যারা পছন্দ করে তাদের জন্যে নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু যারা পছন্দ করে না তাদের যেন বাধ্য না করা হয় ইংরেজী ছেড়ে বাংলা বা হিন্দী মাধ্যমে পড়াশুনা করতে। যারা চায় তাদের জন্যে বাংলা মাধ্যম কলেজও থাকবে, কিন্তু যারা চায় না তাদের যেন সেখানে পড়তে বাধ্য না করা হয়। কার ভবিষ্যৎ কোন্ মার্গে তা বাইরের লোক কী করে জানবে? যারা তাকে চেনে ও তার

মনের খবর রাখে তারাই বলতে পারে কোন্ মাধ্যম তার পক্ষে হিতকর। জাতীয়তা ইত্যাদির প্রশ্ন এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক হচ্ছে ভবিষ্যৎ জীবন ও জীবিকা। একটি ছেলেকে পঙ্গু করে রাখলে কি ভারত উদ্ধার হবে, না বাংলাদেশ লাল হবে? বাংলাদেশ বলতে আমি দুই বাংলাকেই বুঝি।

এতক্ষণ বলা হলো ইংরেজী মাধ্যমের কথা। যেখানে ইংরেজী মাধ্যমে পড়ানো হয় না সেখানে ইংরেজী হচ্ছে অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়। গোড়া থেকেই আবশ্যিক। শোনা যাচ্ছে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী আদৌ পড়ানোই হবে না, আবশ্যিক হিসাবে তো নয়ই, স্বমনোনীত হিসাবেও না। এটা যদি সত্য হয় তবে সরকারী হাই স্কুলগুলির প্রাথমিক বিভাগ এখন থেকে ইংরেজীশূন্য হবে। বেসরকারী হাইস্কুলগুলি যদি সরকারী অনুদাননির্ভর হয় তবে সরকারের ইচ্ছা অমান্য করা তাঁদের সাধ্য নয়। ছাত্রছাত্রীদের ইচ্ছা অনিচ্ছা কেউ বিবেচনা করবেন না। অথচ ভবিষ্যৎ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তো তাদেরি হবে। একজন শিক্ষক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি বলেন এর মধ্যেই কয়েকটি বেসরকারী বিদ্যালয় বেশী বেতন নিয়ে ইংরেজীতে পড়াচ্ছে বা ইংরেজী পড়াচ্ছে। অভিভাবকরা সেইসব বিদ্যালয়েই ছেলেমেয়েদের পাঠাচ্ছেন। ফলে ছাত্রসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। যারা ইংরেজীনবিশ ও যারা বাংলানবিশ। এটা কি ভালো হচ্ছে?

আমার মতে ইংরেজী শেখা দশবছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু পরে তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে, নয়তো ছেলেরা ইংরেজীতে কাঁচা থেকে যাবে। আমি নিজে কী করেছি তা বলছি। আমার বড়ছেলেকে আটবছর বয়স পর্যন্ত ইংরেজী শিখতে দিইনি। তার মা ইংরেজীভাষিণী, তাঁকেই বাংলা শিখতে হয়েছে ছেলেকে বাংলা শেখাতে ও বাংলায় শেখাতে। আটবছর বয়সে সে

বাংলায় সবকিছু পড়েছিল, তবু শান্তিনিকেতনের পাঠভবনের কর্তারা তাকে তার সমবয়সীদের ক্লাসে ভর্তি করতে নারাজ হলেন, যেহেতু সে ইংরেজী একেবারেই জানে না। তাকে বলা হলো সব চেয়ে নিচের ক্লাসে ভর্তি হয়ে দু'বছর পিছিয়ে থাকতে। ছেলের দুটো বছর নষ্ট হতো, যদি আমি এ প্রস্তাব মেনে নিতুম। ওকে বাড়িতেই ইংরেজী শেখাতে শুরু করি, তিন বছর বাদে একজন ইংরেজ হেডমাস্টার ওকে হাইস্কুলে ওর সমবয়সীদের ক্লাসে ভর্তি করে নেন। ম্যাট্রিকে ও প্রথম শ্রেণীতে পাস করে। ইংরেজীতে পায় শতকরা সত্তরের বেশী। গোড়া থেকে ইংরেজী শেখেনি বলে ওর তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ওর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। সেটা ক'জনের সাধ্যে কুলোয়? এগারো বছর বয়সে ইংরেজী শিখতে শুরু করলে কি কোনো হাই স্কুলেই ওর ঠাঁই হতো? ওকে প্রাইভেট ম্যাট্রিক দিতে হতো। ফলাফল অনিশ্চিত।

সরকার তাঁদের হাইস্কুলে যা করতে চান করুন, কিন্তু বেসরকারী স্কুলগুলিকে যেন একই নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য না করেন। ওরা যদি পরবর্তী পর্যায়ে বিশেষ ব্যবস্থা না করতে পারে তো প্রাথমিক পর্যায়েই ইংরেজী পড়াতে বা ইংরেজীতে পড়াতে শুরু করবে। অভিভাবকদের যাঁর যেমন খুশি তিনি তেমনি পর্যায়েই ইংরেজী পড়ানো বা ইংরেজীতে পড়ানো শুরু করবেন। সরকার যদি অনুদান দিতে না চান তবে সরকারের খুশি। ছেলেমেয়েরা যদি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, একভাগ হয় ইংরেজীনবিশ ও আরেকভাগ বাংলা-নবিশ, সেটা বেআইনী হবে না। আইনে মানুষকে যেসব অধিকার দিয়েছে তার মধ্যে এটাও পড়ে যে অভিভাবক তাঁর পুত্রকন্যার পক্ষে যেটা হিতকর সেইটেই বেছে নেবেন। স্কুল পরিচালকদেরও স্বাধীনতা আছে, তাঁরাও স্থির করবেন কোন্‌টা শ্রেয়।

এর পরে কলেজের কথা। এতদিন বিজ্ঞানের ছাত্রদের অন্যতম

বিষয় হিসাবে ইংরেজী ও বাংলা পড়তে হতো না, কিন্তু হিউম্যানিটিজ তথা বাণিজ্যের ছাত্রদের বেলা সেটা ছিল আবশ্যিক। এখন থেকে তাদের বেলাও আবশ্যিক হবে না। তবে ফালতু পাঠ্য হিসাবে কেউ নিতে পারবে ইংরেজী, কেউ সংস্কৃত, কেউ বাংলা। পাস মার্ক রাখতে না পারলে ক্ষতি হবে না, রাখতে পারলে বাড়তি নম্বরগুলো অন্যান্য বিষয়ের নম্বরগুলোর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। যোগফল লাভজনক হবে। আমি এ সিদ্ধান্তের বিরোধী নই। কারণ আমি ছাত্রদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইংরেজী ও বাংলা শিখতে বাধ্য করা সঙ্গত মনে করিনে। যারা ভালো শিখতে চায় তারা অন্যতম বিষয় হিসাবে বাংলাও নিতে পারবে, ইংরেজীও নিতে পারবে। কিন্তু দুই একসঙ্গে নয়। কলেজ পর্যায়ে এখনো ইংরেজী মাধ্যম চালু আছে। সেইসূত্রে খানিকটে ইংরেজী সকলেরই শেখা হয়ে যায়। আর বাংলা যদিও মাধ্যম নয় তবু কার্যত বাংলাতেই লেকচার দেওয়া হয়ে থাকে, উত্তর-পত্রও বাংলাতেই লেখা হয় অধিকাংশ কলেজে। সেইসূত্রে খানিকটে বাংলাও শেখা হয়ে যায়। অবশ্য সে বাংলা বা সে ইংরেজী জ্ঞান সাহিত্যের জ্ঞান নয়। সাহিত্যের জ্ঞান কলেজে না হলে কি নয়? যাদের তাতে রুচি আছে তাদের বলব অন্যতম বিষয় হিসাবে বাংলা বা ইংরেজী নিতে। আর উচ্চাভিলাষী হলে ফালতু বিষয় হিসাবে হয় বাংলা নয় ইংরেজী নয় সংস্কৃত নিতে।

শিক্ষার সুযোগ যারা পাচ্ছে না তাদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। এ বিষয়ে দ্বিমত থাকা উচিত নয়। কিন্তু শিক্ষার সুযোগ যারা পাচ্ছে তাদের সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে হবে, নইলে সমাজে দুটি শ্রেণী থেকে যাবে, এইখানেই দ্বিমত। একটি শ্রেণী ইংরেজীনবিশ হয়ে বড়ো বড়ো সরকারী চাকরি, বড়ো বড়ো কোম্পানীর চাকরি পাবে, এ রাজ্যে না পেলে অপর রাজ্যে পাবে, এ দেশে না পেলে অপর দেশে পাবে, আরেক শ্রেণী বাংলানবিশ হয়ে ছোট ছোট

চাকরিও পায় কি না সন্দেহ, তাও শুধু এই রাজ্যেই। কেন এই বৈষম্য? ইংরেজীর জন্যেই তো। অতএব তুলে দাও ইংরেজী মাধ্যম, তুলে দাও আবশ্যিক বিষয় হিসাবে ইংরেজী, তুলে দাও ইংরেজী বলে একটা বিষয়, তুলে দাও আপাতত প্রাথমিক পর্যায় থেকে, পরে মাধ্যমিক পর্যায় থেকেও, আরো পরে কলেজ পর্যায় থেকেও। এই যে মনোভাব এর বিপরীত মনোভাব হচ্ছে, প্রত্যেকটি পর্যায়েই ইংরেজী শেখাও, বিষয় হিসাবে তো নিশ্চয়ই, আবশ্যিক বিষয় হিসাবেও। মাধ্যম হিসাবে যেখানে আছে সেখানে রেখে দাও, যেখানে নেই সেখানে প্রবর্তন করো। সুযোগ থেকে কাউকেই বঞ্চিত কোরো না, উল্টে আরো বেশী সুযোগ দাও।

এই দুই চরম মনোভাব জনমতকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। একপক্ষ আরেকপক্ষকে বলছেন, "তোমরা সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করছ। সবাই হবে সমান অন্ধ।" অপরপক্ষ এর উত্তরে বলছেন, "ইংরেজ চলে গেছে, অথচ ইংরেজীর মোহ দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে। এ মোহ কৃষক শ্রমিককেও যদি পেয়ে বসে তা হলে বৈষম্যের আর মূলোচ্ছেদ হবে না।" এই তর্কের সার কথা, সবাই যদি সাহেব হতে চায় তো হোক না কেন সাহেব। সবাই যদি সাহেব হতে না পারে তো একশ্রেণী কেন সাহেব হবে, হোক না কেন জবাই।

আমার মতে এ তর্কের মীমাংসা ছাত্রছাত্রীদের উপরেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। শর্ত শুধু এই। যেটা পড়বে সেটা মন দিয়ে পড়বে, তাতে ফেল করবে না, গ্রেস মার্ক চাইবে না, টোকাটুকি করবে না। সাধ্য বুঝে কাজ।

গণতন্ত্র তথা প্রশাসন

গণতন্ত্রের একাধিক রূপ থাকতে পারে। যেটির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় সেটির একটি নির্দিষ্ট নাম আছে—পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসী। পার্লামেণ্টকে আজকাল সংসদ বলে অভিহিত করে পার্লামেণ্টারিকে সংসদীয় বলে নামাঙ্কিত করা হচ্ছে। কিন্তু বিষয়টিকে অত সংক্ষেপে বোঝানো যাবে না। কারণ উক্তপ্রকার গণতন্ত্র আমাদের দেশে সম্প্রতি প্রবর্তিত হয়েছে, সাত শতাব্দী ধরে বিবর্তিত হয়নি। যেমন হয়েছে ইংরেজদের দেশে।

ওদের দেশেও রাজশক্তি ছিল প্রবল, প্রজাশক্তি ছিল দুর্বল বা অনুপস্থিত। কিন্তু রাজার কাছ থেকে ম্যাগনা কার্টা (মহা সনদ) আদায় করে নেবার পর থেকে ধাপে ধাপে প্রজাদের শক্তি বাড়তেই থাকে। এখন প্রজাশক্তিই রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি। অথচ ইংরেজরা এমন রক্ষণশীল প্রকৃতির জাতি যে রাজাকেও মাথার উপর রেখে দিয়েছে। আর প্রজাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত যে হাউস অব কমন্স তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে রয়েছে হাউস অব লর্ডস। লর্ডরাও প্রজা, তবে তাঁরা কারো নির্বাচিত প্রতিনিধি নন। রাজার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার কাজে তাঁরাই ছিলেন অগ্রণী। প্রজাদের পক্ষ নিয়ে একদা তাঁরাই লড়েছেন। তার ফলে তাঁরাই সরকার গঠন করেছেন। কিন্তু বিবর্তনসূত্রে তাঁরাও আজকাল ক্ষমতাহীন। শোনা যাচ্ছে এই শ্বেতহস্তীদের হস্তীশালাটিকে নাকি উচ্ছেদ করা হবে। কিন্তু এঁরা যতদিন আছেন ততদিন পার্লামেণ্ট বলতে এঁদের হাউসটিকেও বোঝায়। সুতরাং পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসীর সমস্তটাই নির্বাচিত নয়। ছুটন্ত ইঞ্জিনের উপর ব্রেক কষার জন্যে অভিজ্ঞ লর্ডদেরও প্রয়োজন। লর্ডরা যে সব সময়

জমিদারের অপদার্থ বংশধর তা নয়। জ্ঞানী গুণী বীরপুরুষরাও লর্ড হন। বণিকদের তো কথাই নেই, শ্রমিকদেরও লর্ড উপাধি দেওয়া হয়। যাজকরা গোড়া থেকেই লর্ড। ইদানীং মহিলাদেরও লর্ডসভায় আসন দেওয়া হচ্ছে। তবে তাঁরা লর্ড নন, লেডী।

লর্ড কার্জনের উচ্চাভিলাষ ছিল তিনি একদিন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হবেন। যোগ্যতার অভাব ছিল না। আইনেরও বাধা ছিল না। কিন্তু হাউস অব কমন্‌সের তৎকালীন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল চাইলেন যে, প্রধানমন্ত্রী যিনি হবেন তাঁকে তাঁদেরি একজন হতে হবে। তখন থেকে এইটেই রেওয়াজ। উচ্চাভিলাষী লর্ডরা আজকাল কৌলিক উপাধি ত্যাগ করে কমনার হচ্ছেন, তার পরে নির্বাচনে জিতে কমন্‌স সভার সদস্য হচ্ছেন, তার পরে দলপতি হয়ে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন বা হবার আশা রাখছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটেনকে জিতিয়ে দিলেন যিনি সেই উইনস্টন চার্চিল কি তাঁর পূর্বপুরুষ মার্লবরার মতো ডিউক হতে পারতেন না? ডিউক হলে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন না। লর্ড না হয়ে তিনি সার হলেন। অবশ্য যেমন তেমন নাইট নয়, নাইট অব দি অর্ডার অব দ্য গার্টার। নাইটদের মধ্যে কুলীন। অথচ কমন্স সভায় সদস্য বলে প্রধানমন্ত্রী পদের অধিকারী।

মোটামুটি এইভাবে সংজ্ঞা দেওয়া যায় যে, পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসী হচ্ছে সেই ব্যবস্থা যা রাজশক্তিকে নিয়ে আসে প্রজাদের হাতে। প্রজারা সেই শক্তিকে ব্যবহার করে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। প্রতিনিধিরা ব্যবহার করেন তাঁদের নির্বাচিত দলপতির মাধ্যমে। প্রজাশক্তির মূর্ত প্রতীক প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর পেছনে তাঁর দলবল। তাঁদের পেছনে তাঁদের নির্বাচকবৃন্দ। আগেকার দিনে সবাইকে ভোটাধিকার দেওয়া হতো না। সম্পত্তিশালীরাই ভোটার হতেন। মহিলাদেরও ভোট ছিল না। এসব পরিবর্তন খাস ইংলণ্ডেই বর্তমান শতাব্দীতে ঘটেছে। ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক শরিক

এখন সর্বশ্রেণীর নাগরিক। যার সম্পত্তি নেই সেও ভোট দিতে পারে। শ্রমিক কৃষকরাও এখন বিপুল সংখ্যায় ভোট দেয়। তাদের প্রতিনিধিরাও সরকার গঠন করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর পদ এখন শ্রমিকসন্তানদেরও উচ্চাভিলাষলভ্য। তবে রাজপদ নির্বাচনসূত্রে কেউ পান না। ইংরেজরা হাজার গরিব হলেও রাজভক্ত প্রজা। কিন্তু একদিন রাজপদও উঠে যেতে পারে। ইতিমধ্যেই গুঞ্জন উঠেছে যে রানী ও তাঁর আত্মীয়স্বজনের জন্যে অত্যধিক ব্যয় হচ্ছে। আবার রানীও বলছেন যে মুদ্রাস্ফীতির দরুন তাঁর খরচ বেড়ে যাচ্ছে, কিছুতেই ঠাট বজায় রাখা যাচ্ছে না।

যে গণতন্ত্র আমরা প্রবর্তন করেছি সে গণতন্ত্রের ভিৎ চওড়া হতে হতে এত চওড়া হয়েছে যে এখন আর তাকে বড়লোক বা মধ্যবিত্তদের ব্যাপার বলা চলে না। পার্লামেণ্ট এখন আর বুর্জোয়াদের বৈঠকখানা নয়। তবে এখনো বহু সংস্কার বাকী। যাঁরা বলতেন পার্লামেণ্টের দ্বারা কোনো মৌল পরিবর্তন ঘটানো যায় না, ওর জন্যে চাই সোভিয়েট-মার্কা একটা প্রতিষ্ঠান, তাঁরাও আজকাল তাঁদের মত পালটেছেন। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা এখন এত প্রবল যে রক্ষণশীল দলের বণিক ও মধ্যবিত্তরাও তার ভয়ে ভীত। পার্লামেণ্ট আছে বলেই তার উপর চেক আছে। নইলে তাকে রুখবে কে?

রাজশক্তির হাত থেকে ক্ষমতা চলে এসেছে প্রজাশক্তির হাতে। প্রজাশক্তিই এখন সরকার গঠন করে, রাষ্ট্র চালায়। রাজশক্তির চতুরঙ্গবাহিনী এখন প্রজাশক্তির চতুরঙ্গ বাহিনী। আগে ছিল সৈন্য, পুলিস, আদালত ও কারাগার এই নিয়ে চতুরঙ্গ! যে কোনো শাসন ব্যবস্থায় এ চারটি বিভাগ থাকবেই। বিবর্তিত হতে হতে এগুলি এখন পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। এখন আমরা বলি এক্জিকিউটিভ, জুডিসিয়ারি, লেজিসলেটিভ। এক্জিকিউটিভেরই বিভিন্ন অঙ্গ সৈন্য,

পুলিস, কারাগার, ম্যাজিস্ট্রেসী, ডাইরেকটরেট, সেক্রেটারিয়াট ও মিনিস্ট্রি। তা হলেও চতুরঙ্গ হয় না। এর সঙ্গে যোগ করতে হয় ইলেকশন কমিশন ও পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এঁরা কারো তাঁবেদার নন। এঁরা কাজ করেন স্বাধীনভাবে। এঁদের কাজে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। যেমন বিচারকদের কাজে।

এই যে সেদিন লোকসভার সাধারণ নির্বাচনে ত্রিশ বছরের শাসকদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে গেল এর মূলে নির্বাচকসাধারণের ভোট। কিন্তু সেই ভোটেরও তো কারচুপি হতে পারত। হলো না। তার কারণ আমাদের ইলেকশন কমিশন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। কমিশনের অধীনে যাঁরা কর্তব্যরত ছিলেন তাঁরাও স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। বিধানসভার নির্বাচন ক্ষেত্রেও তাঁরা একই রকম স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে আমি একটি কথাও শুনিনি। পুলিসও যথেষ্ট কর্তব্যপরায়ণ ছিল। নইলে কি রিগিং না ঘটে পারত? রিগিং যদি ঘটে থাকে তবে খুব কম জায়গায় ঘটেছে। আমাদের আশঙ্কা অমূলক। ভারতের জনগণ যদি না বুঝে না সুঝে ভুল মানুষকে ভোট দিয়ে থাকে তবে সেটা তাদেরি বোকামি। কিংবা যদি মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডায় বিভ্রান্ত হয়ে থাকে তবে সেটা তাদেরি মূর্খতা। কিন্তু এমন কথা বলা চলে না যে ভোট গ্রহণের ব্যাপারে প্রশাসকদের কোন দোষ ছিল। আমি তো এঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এমারজেন্সী তখনো উঠে যায় নি, শাসকদলের জেতার সম্ভাবনা ষোল আনাই ছিল, আমাদের প্রশাসকরা সহজেই সন্ত্রস্ত হতে পারতেন, প্রলুব্ধ হতে পারতেন, কিন্তু কারো মুখের দিকে না চেয়ে তাঁরা ভোট গ্রহণ করেছেন, ভোট গণনা করেছেন, ভোট ঘোষণা করেছেন। এমন হতে পারে যে তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত শাসকদলের পক্ষে। কিন্তু তা বলে তাঁরা শাসক দলের লোক নন। তাঁরা দলনির্বিশেষে প্রজা পক্ষের লোক। তাঁরা

নিমক খাচ্ছেন যাঁর তিনি রাজা বা রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী 'নন, তিনি শাসকদল নন, তিনি রাষ্ট্র। তাঁদের কমিটমেণ্ট গণতন্ত্রের কাছে।

পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রে একাধিক দল, একাধিক মত। মতের সঙ্গে মতের সংঘর্ষ তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। তাই বলে মারামারি কাটাকাটি বাধে না। বাধতে পারত, যদি মাঝে মাঝে নির্বাচনের ব্যবস্থা ও ক্ষমতা হস্তান্তরের শান্তিপূর্ণ উপায় না থাকত। যদি নির্বাচন-কর্তারা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ না হতেন। সৎ ও সুদক্ষ না হতেন। একবার যদি লোকের মনে সন্দেহ ঢোকে যে ছলে বলে কৌশলে নির্বাচনে জয়লাভ হয়েছে, পরে আবার হবে, তা হলে গণতন্ত্রের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। তখন হয়তো পাকিস্তানের মতো মারামারি কাটাকাটি, সৈন্য তলব, জনতার উপর গুলীবর্ষণে সৈন্যদের অরুচি মিলিটারি ডিকটেটরশিপ অনিবার্য করে। পাকিস্তানে যাঁদের উপরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ভার ছিল তাঁদের মধ্যে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্মচারীর অভাব ছিল কি না বলতে পারব না, কিন্তু ব্যাপকভাবে রিগিং যদি ঘটে থাকে তা হলে দায়িত্বভার কতক অংশে তাদের উপরেও বর্তায়। সর্বদা মনে রাখতে হবে যে গণতন্ত্রের বিধিবিধান নিখুঁতভাবে না মানলে যারা হেরে যাবে তারা 'বিনা যুদ্ধে হার মেনে নেবে না। মরার আগে কামড় দেবে। আমাদের দেশে এতদিন মরণ কামড়ের প্রশ্ন ওঠেনি, কারণ আমাদের দেশে যারা জেতে তারা সাধারণত লোকের ইচ্ছায় যেতে, যারা হারে তারা সাধারণত লোকের ইচ্ছায় হারে। আমাদের নির্বাচনব্যবস্থার উপর লোকের আস্থা আছে বলেই আমরা এতদিন নির্বাচনের ফলাফল দেখে মাঠে ঘাটে বাটে লড়াই শুরু করে দিইনি। নির্বাচনও একপ্রকার লড়াই। কিন্তু এমন এক লড়াই যার রেফারিরা অপক্ষপাত। যেমন ফুটবলের। রেফারিদের সর্বদা জনগণের আস্থাভাজন হতে হবে। নইলে জনগণও হতাশ হয়ে বলবে, এর চেয়ে

মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ ভালো। সৈন্যরা তো আমাদের মারছে না, আমাদের বরং মার থেকে রক্ষা করছে।

জনগণের মনোভাব পাকিস্তানে যেমন বাংলাদেশেও তেমনি, ভারতেও তেমনি। রাজনীতিকদের দোষে বা প্রশাসকদের প্রশ্রয়ে যদি গণতন্ত্রের এন্তেকাল হয় আর ওরা যদি একনায়কতন্ত্রে অভ্যস্ত হয়ে যায় আমাদেরও মনে ছোঁয়াচ লাগবে। আর আমরা যদি গণতন্ত্রে দৃঢ় থাকি ওদের মতিগতিও বদলাবে। গণতন্ত্র সর্বত্র নিরাপদ হবে। বিচ্ছিন্ন হলেও আমরা একবৃন্তে তিনটি ফুল। কিন্তু কথাটা হলো, নির্বাচন ব্যবস্থাকে সর্বসাধারণের অবাধ ও স্বাধীন মতপ্রকাশের মাধ্যম করতে হবে। এখানে দায়িত্বশীল কর্মচারীদের একটা ভূমিকা আছে। সে ভূমিকা গুরুতর। তাঁরা যদি অন্যায় করেন বা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন তা হলে গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ থাকবে না। গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হচ্ছে নাগরিকদের মতবিরোধকে নির্বাচনের মাধ্যমে ফুটবল ক্রিকেটের মতো শান্তিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ দেওয়া। গণতন্ত্রের খেলার নিয়মও ফুটবল ক্রিকেটের মতো সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়ার জন্যে বিবর্তিত হয়েছে ও হচ্ছে।

নির্বাচনের পরবর্তী অধ্যায় সরকার গঠন। খেলার নিয়ম অনুসারে যাঁরা ব্যাট ধরেন, বরাবর তাঁরা ব্যাট ধরেন না, অপর পক্ষকেও ব্যাট ধরার সুযোগ দেন। কিন্তু অপর পক্ষ যদি জনসাধারণের আস্থা অর্জন করতে না পারে তা হলেও তাকে ব্যাট ধরতে দিতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। আস্থা অর্জন, আস্থা রক্ষণ এদুটি হচ্ছে গণতন্ত্রী সরকারের আবশ্যিক শর্ত। আস্থা বলতে কেবল পার্লামেন্টের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ সদস্যের আস্থা নয়, দেশের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ নাগরিকের আস্থা। ছলে ও কৌশলে পার্লামেন্টারি মেজরিটি রক্ষা করা সম্ভব, এমারজেন্সী ঘোষণা করে তার বলেও পার্লামেন্টারি মেজরিটি রাখা যায়। সেটা কিন্তু দেশের নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত

মেজরিটি নয়। ধরা পড়ে যায় নির্বাচনের সময়। নির্বাচনও একপ্রকার যুদ্ধ। যুদ্ধই হচ্ছে ফাইনাল টেস্ট।

সরকার গঠনের কথা হচ্ছিল। সরকারের প্রধান দুটি কর্তব্য রাজতন্ত্রেও যা গণতন্ত্রেও তাই। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। এ দুটিতে অবহেলা ঘটলে রাজারও রাজত্ব যায়, গণতন্ত্রী সরকারেরও গণেশ ওলটায়। আধুনিক যুগে কর্তব্যের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে, তাই বিভাগের পর বিভাগ সৃষ্টি হচ্ছে। আর সেইসব বিভাগের জন্যে কর্মচারী নিয়োগেরও অন্ত নেই! সব মিলিয়ে যেটা দাঁড়ায় সেটার নাম আমলাতন্ত্র বা ব্যুরোক্র্যাসী। সেই আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করারও একপ্রস্থ বিধিবিধান আছে। পাঁচবছর অন্তর অন্তর সরকার বদল হতে পারে, কিন্তু সরকারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কর্মচারীরা গদি থেকে নামেন না, গদিতে বসেন না। মন্ত্রীরা জানেন যে তাঁদের স্থিতিকাল পাঁচ বছর। যদি না আবার নির্বাচনে জেতেন ও আবার মন্ত্রী হন। আর সরকারী কর্মচারীরা জানেন যে তাঁদের কার্যকাল ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ বছর। যদি তাঁরা সৎ ও সুদক্ষ হয়ে থাকেন। নয়তো তাঁদেরও কর্মকাল কম হতে পারে।

যেখানে কর্মচারীর সংখ্যা অগুন্তি সেখানে কে সৎ কে অসৎ তা টের পাবে কে? খোঁজ রাখার জন্যে আরো একদল কর্মচারী রাখতে হয়, তাঁরাই উপরওয়ালাদের খবর দেন। কিন্তু তাঁরা নিজেরাই সৎ কি অসৎ তাই বা বোঝা যাবে কী করে? এ এক কঠিন সমস্যা। সাধারণের দিক থেকে রাশি রাশি অভিযোগ আসে, কিন্তু সাক্ষী কোথায়, প্রমাণ কোথায়? বিনা বিচারে অভিযুক্তকে দণ্ড দেওয়া কি উচিত? তাই অধিকাংশ অভিযোগই খারিজ হয়ে যায়। লোকে ভাবে নালিশ্ করা নিষ্ফল। তার চেয়ে যার যা দস্তুরি দিয়ে যাও, কাজটা তো হাসিল হোক। নয়তো তুমিই মরবে, ওর গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। লোকে আরো ভাবে, কার কাছে নালিশ করবে? সব

ক'টাই তো মাসতুতো ভাই। ভিতরে ভিতরে ভাগাভাগি আছে। যে যা নেয় ভাগ দেয়।

এর প্রতিকার কি বদলী? একবার আমি জানতে পারি যে আমার পেশকারটি অসৎ। তাঁকে বদলী করে অন্য একজনকে পেশকার করি। এই কর্মচারীটি সাধু, এক পয়সা খান না। কিন্তু একেবারেই আনাড়ি। একে দিয়ে পেশকারের কাজ চলে না। যার কাজ তার সাজে। নয়তো আমাকেই পেশকারি করতে হয়। হাকিম যদি পেশকারের কাজ করে তবে হাকিমের কাজ করবে কখন? লোকটা যখন কান্নাকাটি করে আমি রাগের ভান করি, তারপর নরম হয়ে বলি, আচ্ছা, এবার মাফ করলুম, আবার যদি ওরকম দেখি তো বরখাস্ত করব। মনের আনন্দে পেশকার নিজের জায়গায় ফিরে আসেন। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি যে কাজকর্ম দক্ষতার সঙ্গে চলবে।

পশ্চিমে একটা প্রবাদ আছে, সুন্দরীরা সতী হয় না, সতীরা সুন্দরী হয় না। ওটা অবশ্য রসিকতা। কিন্তু দেখে শুনে আমার মনে হতো, যারা এফিসিয়েন্ট তারা অনেস্ট নয়, যারা অনেস্ট তারা এফিসিয়েন্ট নয়। সরকারী কাজকর্মে এফিসিয়েন্সি না থাকলে চলে না। এফিসিয়েন্সি না থাকলে সরকারও চলে না। যত কিছু পুরস্কার সমস্তই তো এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্যে। সাধুতার জন্যে কে কবে কী পুরস্কার পেয়েছেন? ওটা দারোয়ান বা চৌকিদারের জন্যেই বরাদ্দ। অপরপক্ষে অদক্ষতার জন্য তিরস্কার, জরিমানা, প্রমোশন বন্ধ, ডিমোশন, অকালে অবসর নিতে বাধ্য করা। এই সম্প্রতি কত লোককে পঞ্চাশ বছর বয়সেই অপসারণ করা হয়েছে। ওঁরা যদি অসাধু হতেন আমি দুঃখ করতুম না। ওরা নাকি অদক্ষ। কিন্তু এর পরিণাম কী হবে কর্তারা পরে টের পাবেন। আমার অভিজ্ঞতা এই যে যাঁর চাকরি যত ক্ষণস্থায়ী তিনি তত অসাধু হন।

মোগল আমলের মতো তিনি রাতারাতি আখের গুছিয়ে নেন। ব্রিটিশ আমলে চাকরি দীর্ঘস্থায়ী হয়। চাকরির পরে বাঁধা পেনসন। তাড়াতাড়ি আখের গুছিয়ে নেবার জন্যে চাড় থাকে না। তা ছাড়া যেখানে যত বেশী প্রলোভন সেখানে তত বেশী মাইনে। একালে প্রলোভন বহুগুণ বেড়ে গেছে। সরকার কোটি কোটি টাকা ঢালছেন। মাইনে কিন্তু সেই অনুপাতে বাড়েনি। একালের পাঁচশো টাকা সেকালের দেড়শো টাকা। মুদ্রাস্ফীতি তো সমানে চলেছে, সব জিনিসের দামও সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখছে।

পেট যদি না ভরে তবে এফিসিয়েন্সী কতদিন বজায় থাকবে? কর্মচারীরা দেখছেন নুন আনতে পান্তা ফুরায়, পান্তা আনতে নুন। এমন অবস্থায় গণতন্ত্রের গুণগান করবে কে? দেশটা বিলেত নয় যে গণতন্ত্র বদ্ধমূল। গণতন্ত্রই একদিন হাওয়ার সঙ্গে উড়ে যাবে। সেইজন্যেই বলি, গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ সৎ ও সুদক্ষ প্রশাসন। আর সৎ ও সুদক্ষ প্রশাসনের রক্ষাকবচ সদাজাগ্রত জনমত। লেখকদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, যাতে তাঁরা অকুতোভয়ে মতপ্রকাশ করতে পারেন। বক্তাদেরও দিতে হবে অনুরূপ স্বাধীনতা। বলা বাহুল্য, তাঁরাও তাঁদের স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করবেন। সমস্যাটা এত সরল নয় যে এক সরকারের গদিতে আরেক সরকার বসলেই সঙ্গে সঙ্গে সমাধান হবে। সোজাসুজি স্বীকার করতে হবে যে স্বাধীনতার পর থেকে আমরা দুটি মারাত্মক ভুল করেছি। একটি হচ্ছে, গেট রিচ কুইক। সারা দেশটাই রাতারাতি বড়লোক হতে চায়। ইংলণ্ড যা দু'শো বছরে করেছে আমরা তা দু'তিনটে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দিয়ে করব। ফলে গরিব আরো গরিব হয়েছে। অন্য ভুলটা হলো, গেট পাওয়ারফুল কুইক। তার জন্যে চাই চীনের মতো সৈন্যবল, মার্কিনের মতো পারমাণবিক শক্তি। দেখতে দেখতে আমরাও হয়ে যাবো সুপার পাওয়ার। যদিও সাধারণ লোক না খেতে পেয়ে

আরো দুর্বল। শিশুদের দুধ জোটে না। গোরুগুলোও না খেতে পেয়ে ধুঁকছে।

কোনোরকম রক্ষাকবচেই কুলোবে না, যদি না আমরা সচেতন হই। পলিসিগুলো প্রশাসকদের নয়, সরকারের। আর সরকার তো জনগণের। জনগণকেই দায়িত্ব নিতে হবে।

কোন্‌খানে দাঁড়ি টানব

এমন কতকগুলি কাজ আছে যা আমরা না করতে পারলে আমাদের উত্তরপুরুষ করবে। উত্তরপুরুষ না করতে পারলে তার উত্তরপুরুষ করবে। তার উত্তরপুরুষ না পারলে তারও উত্তরপুরুষ করবে। করণীয় যদি হয়ে থাকে তবে কোনো না কোনো পুরুষ করবেই। আমাদেরই করতে হবে, নয়তো কেউ কোনোকালে করবে না, এটা ওই কাজগুলির বেলা প্রযোজ্য নয়। অথচ প্রতিদিনই আমরা আমাদের অক্ষমতার জন্যে শিরঃপীড়া অনুভব করি। আমাদের সমসাময়িকরাও আমাদের সমালোচনা করে, টিটকারী দেয়। যেন আমরাই ইতিহাসের কাছে জবাবদিহি করতে জন্মেছি।

আবার এমন কতকগুলি কাজ আছে যা আমাদেরই করে যেতে হবে, আমরা যদি না করি তবে আর কেউ কোনোদিন করবে না। উত্তরপুরুষ আমাদের শূন্যতা পূরণ করতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথের বাসনা ছিল তিনি মহাভারতের থেকে এপিসোড বেছে নিয়ে নাটিকা বা নাট্যকাব্য লিখবেন। লিখেওছিলেন কয়েকটি। কিন্তু বিশ্বের তথা ভারতের দায় সম্পন্ন করতে গিয়ে এ জীবনে আর অবকাশ খুঁজে পেলেন না। আমাকে একদিন চলন্ত ট্রেনের একমাত্র সাথী পেয়ে বলেন, "তুমিই লেখ।" এপিসোডটা আধুনিকদের পক্ষে আধুনিক। লিখতে লোভ হয়। কিন্তু যার কর্ম তারে সাজে। অন্য লোকে লাঠি বাজে। আমি সবিনয়ে নিবেদন করি, "গুরুদেব, এটি আপনাকেই করে যেতে হবে, আমার অসাধ্য।"

আমি অনেকসময় চিন্তা করি যে বিশ্বের তথা ভারতের ভার যদি তাঁকে বইতে না হতো তা হলে তিনি তাঁর অপূর্ণ সৃষ্টিকামনাগুলিকে রূপায়িত করবার জন্যে যথেষ্ট অবসর পেতেন। তাঁর জীবনের শেষ

ত্রিশবছর যদি বিশুদ্ধ সৃষ্টির লীলায় অতিবাহিত হতো তা হলে তাঁর অমূর্ত সৃষ্টিকল্পনাগুলি তাঁর প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হতো না। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তিনি কয়েকটা গল্পের বা উপন্যাসের প্লট দিয়ে বলেছিলেন, "তুমিই লেখ।" এটা চারুবাবুর মুখেই শোনা। চারুবাবু তো রবীন্দ্রনাথ নন। তিনি পারবেন কেন? রবীন্দ্রনাথ যেখানে রবীন্দ্রনাথ সেখানে তিনি অনন্য। তাঁর পুত্র বা শিষ্য সেক্ষেত্রে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে অক্ষম। একথা যে-কোনো কবি বা শিল্পীর বেলাও খাটে। অবনীন্দ্রনাথ যেটা পারতেন নন্দলাল সেটা পারতেন না। শরৎচন্দ্র যেটা পারতেন তারাশঙ্কর সেটা পারতেন না। যদিও এঁরাও শক্তিশালী শিল্পী বা সাহিত্যিক। এঁরাও অনন্য।

অনিচ্ছা বা অনীহাসত্ত্বেও কতকগুলি দায় আমাদের বহন করতে হয়, যেমন দেশের স্বাধীনতার বা গণতন্ত্রের বা সামাজিক ন্যায়ের দায়। স্বাধীনতা বিপন্ন হলে আমরা যদি লেখনী ছেড়ে অস্ত্র তুলে নিই কিংবা লেখনীকেই অস্ত্রের মতো ব্যবহার করি তা হলে সেটা একপ্রকার আপদ্ধর্ম। কিন্তু তার জন্যে যদি জীবনের বিশ ত্রিশ বছর উৎসর্গ করতে হয় তবে সেটা সৃষ্টির ধারাভঙ্গ ঘটায়। সাহিত্যের বা সঙ্গীতের বা চিত্রের বা নৃত্যের ধারা শুকিয়ে যায়। কেবল ব্যক্তি-বিশেষের জীবনে নয়, জাতির জীবনেও। সম্প্রতি গণতন্ত্র বিপন্ন হয়েছিল। আমরা যে যা পারি করেছি, কেউ কেউ তো কারাবরণও করেন। বিশ মাসের মধ্যেই গণতন্ত্রের বিপদ কেটে গেল। আমাদের অসীম সৌভাগ্য যে সাধারণ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ও নির্বাচনের ফলাফল দেখে এমারজেন্সী প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু সাধারণ নির্বাচন যদি বছরের পর বছর পেছিয়ে দেওয়া হতো, পরে একদিন অনুষ্ঠিত হলে যদি অবাধ ও নিরপেক্ষ না হতো, ছলে বলে কৌশলে তার ফলাফল যদি অন্যরূপ হতো তা হলে আমরা কি

সহজ ? সাহিত্যিকের কাব্য উপন্যাসের চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বও কম মূল্যবান নয়। শেকসপীয়ার মানুষটা কেমন এ নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই, কারণ তাঁর জীবন সাধারণের অপরিজ্ঞাত। টি এস এলিয়ট নিষেধ করে গেছেন কেউ যেন তাঁর জীবনী না লেখে। কিন্তু শুনছে কে ? ডি এইচ লরেন্সের জীবনীর সংখ্যা বোধহয় শতসংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে। ইংলণ্ডের বাঘা বাঘা রাজনীতিকদের জীবনীর সংখ্যা এর ধারে কাছে যায় না। নেপোলিয়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছেন গ্যেটে আর বায়রন। লেনিনকে অতিক্রম করে গেছেন টলস্টয়। সুতরাং লক্ষ্য রাখতে হবে ব্যক্তিত্ব যেন ভয়ের চাপে বা লোভের টানে বেঁকে না যায়। খাড়া থাকতে পারাও একটা সাধনা। সেখানে দাঁড়ি টানতে নেই। টানলে সমূহ ক্ষতি।

নতুন সৃষ্টির প্রতীক্ষায়

আমার একটি গল্পের নাম "মহাপ্রস্থানের পথপ্রান্তে"। গল্পের নায়কের মতো আমিও এখন মহাপ্রস্থানের পথপ্রান্তে। কিন্তু এখন আমি ওর মতো সম্পূর্ণ হতাশ আর ক্লান্ত আর ব্যর্থ নই। দেশের মতিগতি অপ্রত্যাশিত এক মোড় নিয়েছে। কী করে এই অলৌকিক ঘটনা সম্ভব হলো কেউ ঠিক জানে না। যে যার খুশিমতো অনুমান করছে। তা হলে আমিই বা কেন আমার খুশিমতো অনুমান করব না? আমার অনুমানটা এই যে ভারতের অন্তরে আছে এক স্বয়ংশোধিকা শক্তি। সে আপনাকে আপনি সংশোধন করতে পারে। বরাবরই এই শক্তির উপর আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু মাঝখানে এ বিশ্বাস টলমল করছিল। সেই টলমলে ভাবটা কেটে গেছে। ভুল যদি আবার কোনোদিন ঘটে তবে তার সংশোধনও আবার একদিন ঘটবে। না, আমি আর হতাশ নই। আমিও একটু আধটু সংশোধনের চেষ্টা করেছি। সুতরাং আমি ব্যর্থ নই। কিন্তু ক্লান্ত। আমি এখনো ক্লান্ত। এ ক্লান্তি বার্ধক্য থেকে নয়। অতিশ্রম থেকেও নয়। আমার চাই একটা রসায়ন। যে রসায়ন আবার আমাকে সৃষ্টিতৎপর করবে। ইনটেলেকচুয়াল হিসাবে আমি যা দেবার তা দিয়েছি। কিন্তু আর্টিস্ট হিসাবে যা দিতে চেয়েছি তা দিতে পারিনি। দিতে হবে, এটাই আমার উপর জীবনদেবতার নির্দেশ। এইজন্যেই বাঁচা। মহাপ্রস্থানের পথপ্রান্তে এসে পৌঁছলেও প্রস্থানের জন্যে আমি প্রস্তুত নই। আমার প্রস্তুতিটা নতুন এক সৃষ্টির জন্যে। তার জন্যে চাই একটা রসায়ন। প্রতীক্ষায় আছি।

আমার কাছে দেশ যেমন সত্য যুগও তেমন সত্য। এই দেশে আমি জন্মেছি। আর কোনো দেশে জন্মাইনি। তেমনি, এইযুগে

আমি জন্মেছি। আর কোনো যুগে জন্মাইনি। যুগের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যুগের মর্মকথাও আমি ব্যক্ত করে যাব। যেমন দেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দেশের মর্মকথা। এটাও আমার উপর আমার জীবনদেবতার নির্দেশ। দেশের উত্তরাধিকারের মতো যুগের উত্তরাধিকারও আমি মহামূল্য মনে করি। তাই টলস্টয়, চেখভ, রলাঁ, বার্নার্ড শ, বারট্রাণ্ড রাসেল আমার কাছে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দের মতো আপনার। বাল্যকাল থেকেই আমি যুগসচেতন। আমি যে বিংশ শতাব্দীর সন্তান এ নিয়ে আমি বেশ গর্ব বোধ করতুম। প্রথম মহাযুদ্ধও আমার সে গর্বকে টলাতে পারে না, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাকে লজ্জায় ম্রিয়মাণ করে।

গত পাঁচ শতাব্দীর আধুনিক যুগ পৃথিবীর চেহারা বদলে দিয়েছে তা তো সকলেই প্রত্যক্ষ করছে। সর্বমানবের পক্ষে এটা নিশ্চয়ই অগ্রগতি। কিন্তু আমার এক ইংরেজ অধ্যাপক আমাকে বলেছিলেন, "অগ্রগতিটা কিসের অভিমুখে? পাটনা কলেজ থেকে গঙ্গার গর্ভের অভিমুখে ধাবিত হওয়াও তো অগ্রগতি। তা যদি কর তবে তুমি তলিয়ে যাবে।" যুক্তিটা সে বয়সে আমার মনে ধরেনি। কিন্তু বাহান্ন বছর পরে এখন আমারও সেই একই যুক্তি। অগ্রগতিটা কিসের অভিমুখে? সভ্যতা যদি ধ্বংসের অভিমুখেই ধাবিত হয়ে থাকে তবে আমরা যারা এই ধাবমান জেট প্লেনের আরোহী হয়ে বিশ্বপরিক্রমায় বাহির হয়েছি তাদের পরিণাম ভাবতে গেলে শিউরে উঠতে হয়। আমাদের নিয়তি নির্ভর করছে পাইলটের উপরে। পাইলট কি অভ্রান্ত? আর পাইলটও অসহায়, যদি ইনজিন ফেল করে বা হঠাৎ আগুন ধরে যায়।

বুদ্ধিজীবীদের কাছে সকলেই প্রত্যাশা করে মুশকিল আসান। কোথাও কিছু বিগড়ে গেলে লোকে বলে, "বুদ্ধিজীবীরা নীরব কেন? নিষ্ক্রিয় কেন?" কিন্তু একালের সমস্যাগুলো এমন জটিল যে জট

খুলতে না পারলে শুধুমাত্র হাত লাগিয়ে আমরা কে কী করতে পারি ? জেট প্লেনে যদি আগুন ধরে যায় তবে যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা সেরা বুদ্ধিজীবী তাঁরা অভ্রভেদী চিৎকার করে বা আগুনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেউ কিছু সুফল দেখাতে পারবেন না। যা হবার তা হবেই। গত দুই মহাযুদ্ধের সময় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা দেখে বিশ্বাস হয় না যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁদের ভূমিকা আরো গৌরবের হবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি বাধে। আমরা বড়ো জোর আশা করতে পারি যে বাধবে না। কিন্তু আশা করা ও নিশ্চিত হওয়া কি এক ? তা বলে একেবারে হাত গুটিয়ে চুপ করে থাকা যায় না। সেটা মানুষের মতো কাজ নয়। মানুষ ভাববে, বলবে, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে। কে জানে জট হয়তো খুলে যাবে। এটা শুধু বুদ্ধিজীবীদের নয়, মানুষমাত্রেরই কর্তব্য।

এটা কেবল যুদ্ধের যুগ নয়, বিপ্লবেরও যুগ। কেউ বলতে পারে না কোথায় কবে বিপ্লব ঘটবে। যাঁদের মতে ওটা ঘটাই বাঞ্ছনীয় তাঁদের আমি বলব, ঘটলে যেন বিনা রক্তপাতে ঘটে। তাঁরা হেসে উড়িয়ে দেবেন, জানি। তবু আমার বক্তব্য ও ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। যাঁদের মতে ওটা ঘটাই উচিত নয়, তাঁদের আমি বলব, তা হলে আপনারা বিপ্লবের বিকল্প খুঁজে বার করুন। যাতে সত্যিকার পরিবর্তন ঘটে। বিনা পরিবর্তনে বিপ্লবের গতি রোধ করা যাবে না। আর সেটা যদি অবশ্যম্ভাবী হয় তবে হিংসা প্রতিহিংসাকেই বা রোধ করবে কে ?

যে ঘটনা মোড় ঘোরায়

শান্তিনিকেতন থেকে এসেছিলুম আমরা স্বামী-স্ত্রী দিন তিন চার কলকাতায় কাটাতে। তখন থেকেই কলকাতায় রয়েছি সাড়ে দশ বছর। সেই তিন চার দিনের মধ্যেই আমাদের জীবনের মোড় ঘুরে গেল। আমাদের ইচ্ছায় নয়। এককথায় বলা যেতে পারে বিধাতার ইচ্ছায়। বিধাতার ইচ্ছা অঘটনঘটনপটীয়সী। অমন ঘটনা যে ঘটতে পারে সেটা আমাদের কল্পনার বাইরে।

সকালে উঠে চা খেতে বসেছি, আগে থেকে খবর না দিয়ে অমিতাভ গুপ্ত এসে হাজির।

"পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব হাসান ইমাম আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন। চলুন, আপনাকে তাঁর ওখানে নিয়ে যাই।" অমিতাভ আমাকে অবাক করে দেয়।

"সে কী! এত সকালে কেউ কারো সঙ্গে দেখা করতে যায়! আমি বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হইনি।" আমি অনুযোগ করি।

"আপনি চট করে তৈরি হয়ে নিন। আমি অপেক্ষা করছি। সামনেই একুশে ফেব্রুআরি। সেদিন আমরা যে অনুষ্ঠান করছি তাতে জনাব হাসান ইমাম যোগ দিতে রাজী হয়েছেন। এবারকার অনুষ্ঠানে দুই বাংলার প্রতিনিধি থাকবেন। আপনিও তো এই চান। আপনি সেদিনকার সভাপতি। আর জনাব হাসান ইমাম প্রধান অতিথি।" অমিতাভ যা বলে যায় এটা তার যথাযথ অনুলিখন নয়, মর্ম এইরূপ।

আমার হাতে অন্য কাজ ছিল। আমি ওকে দিয়ে কড়ার করিয়ে নিই যে আধঘণ্টার বেশী থাকব না। শূন্য ফ্ল্যাটে স্ত্রীকে একা রেখে

যাচ্ছি। ফ্ল্যাটটা আমাদের কনিষ্ঠ জামাতার। মেয়ে জামাই আমাদের উপর ভার দিয়ে পুরী গেছে।

হাসান ইমাম সাহেব যৎপরোনাস্তি সমাদর করলেন। আমার লেখা তিনি যত্ন করে পড়েছিলেন ও মনে রেখেছিলেন। ভদ্রলোক একান্ত অমায়িক, নম্র ও শান্ত। বোধহয় অধ্যাপক ছিলেন, পথ ভুলে ডিপ্লোমাট হন। হুগলী জেলায় বাড়ি, পথ ভুলে পাকিস্তানে যান। রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত। ইউনাইটেড নেশনসে যখন পাকিস্তানের দূতাবাসে কাজ করতেন তখন তিনি ও অন্যান্য বাঙালীরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন। পশ্চিমা সহযোগীরা থামাতে চাইতেন। তাঁরা বাংলাবিরোধী, হিন্দুবিরোধী, রবীন্দ্রবিরোধী। হাসান ইমাম বললেন, "রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে, গান থেকে, আমরা কত সান্ত্বনা পাই! কিন্তু ওরা সে কথা শুনবে না। বাংলার প্রতি বাঙালীর টান ওরা সন্দেহের চোখে দেখে।"

হাসান ইমাম সাহেবের চোখে মুখে ভয়ের ছাপ। তাঁর এই বাংলাপ্রীতি ও রবীন্দ্রভক্তি তাঁকে বিপাকে ফেলতে পারে। আমার সঙ্গে নিভৃত আলাপও হয়তো পাকিস্তানের কর্তাদের বিচারে চক্রান্ত।

আমরা সেদিন রাজনীতি আলোচনা করিনি। হিন্দু-মুসলমানদের সেই পুরাতন সমস্যারই রোমন্থন করেছি। হাসান ইমাম সাহেব বলেন, "আপনিই তো লিখেছেন হিন্দু মুসলমানের মামলাটা তত্ত্বের মামলা নয়, স্বত্বের মামলা। সেইটেই ঠিক।"

হ্যাঁ, আমিই লিখেছিলুম দেশ ভাগের দশ এগারো বছর আগে। স্বত্বের মামলা অবশেষে বাঁটোয়ারার মামলায় গড়ালো। যেটা তিনিও চাননি, আমিও চাইনি। তিনি আর আমি সমান দুঃখিত। আমরা জানি যে এর আর রদবদল নেই। মুখে যে যাই বলুক বাঙালী হিন্দুরাও রদবদল চায় না। বাঙালী মুসলমানরা যেটা চায় সেটা পাকিস্তানে তাদের মাতৃভাষার সমান মর্যাদা, সেইসূত্রে

পশ্চিমাদের সঙ্গেও সমান মর্যাদা। যারা হিন্দুপ্রাধান্য চায়নি তারা পশ্চিমাপ্রাধান্য চাইবে কী করে ?

বাংলাদেশের স্বাধীনতা তখনো কারো মনে উদয় হয়নি। আমাদের মনে তো নয়ই। বছর তিনেক পরে ঢাকার অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ সাহেবের মুখেই প্রথম শুনি যে আপাতত অটোনমি চাইলেও তাঁদের মনের কথা আখেরে ইণ্ডিপেনডেন্স। আমি তাঁকে সাবধান করে দিই যে ওতে ভয়ঙ্কর বিপদ।

যাক, হাসান ইমাম সাহেব তো আমাকে কিছুতেই আধঘণ্টার পরে ছেড়ে দেবেন না, ব্রেকফাস্ট টেবিলে নিয়ে গিয়ে নাস্তা খাওয়াবেন। আমি যতই বলি যে ওদিকে আমার স্ত্রী আমার পথ চেয়ে বসে আছেন, আমি না গেলে ওঁর খাওয়া হবে না, তিনি অবুঝ। বাসায় ফিরতে আমার দেরি হয়ে যায়।

ফিরে এসে দেখি পাশের ফ্ল্যাটে যে দক্ষিণ ভারতীয় প্রতিবেশীরা থাকতেন তাঁরা আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছেন। আমাকে আমার জামাতার ফ্ল্যাটে ঢুকতে না দিয়ে তাঁদের ফ্ল্যাটে নিয়ে যান। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন আমার বন্ধু ডাক্তার অমল গাঙ্গুলী। তিনি বলেন "অন্নদা, তোমার স্ত্রীর কেসটা সার্জিকাল। সার্জনকে ডাকতে হবে। আমি তোমার বৈবাহিককে টেলিফোন করতে বলেছি।"

আমি তো হতভম্ব। জামাতার ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দেখি স্ত্রী সেখানেই পড়ে আছেন। তাঁকে সরানো বারণ। বৈবাহিক আসেন সার্জন নিয়ে। সার্জন পরীক্ষা করে বলেন ডান পাশের উরুদেশের ফীমর ভেঙে গেছে। হাসপাতালে পাঠাতে হবে। সে অনেক কাণ্ড।

হাসপাতালে অপারেশন হয়। অপারেশন সাকসেসফুল হয়। কিন্তু যে সার্জন অপারেশন করেন তিনি বলেন হাড় ঠিকমত জোড়া লাগল কি না সেটা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। রোগিণী

যেন দু'বছরকাল কলকাতায় থাকেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করা চলবে না। একতলায় থাকা দরকার ।

জামাতার ফ্ল্যাটে ঠাঁই নেই, 'ওরা যে আমাদের থাকতে দিয়েছিল সেটা ওদের বদলে। আর ওদের ওটা একতলায় নয়, দোতলায়। অগত্যা আমাদের অন্য ফ্ল্যাট খুঁজতে হলো। কোনো মতেই ঠিক সময়ে পাওয়া যেত না, যদি না একটি সদ্য নির্মিত ফ্ল্যাট সে সময় খালি থাকত ও সেটি আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা নিজের জন্যে আগে থেকে বুক করে থাকত। সে ওটা আমাদের ছেড়ে দেয়। আমরা অল্পকালের জন্যেই নিই। কিন্তু পরে আর কোনো ফ্ল্যাটে উঠে যাইনে, সেইখানেই থেকে যাই। বছরের পর বছর কেটে যায়। সার্জন দেখে শুনে সন্তুষ্ট হন। কিন্তু ওদিকে শান্তিনিকেতনের বাসা ছেড়ে দিয়েছি। যেতে চাইলে আবার বাসা ভাড়া করতে হবে। সেটা সহজ নয়।

ইতিমধ্যে আমাদের জীবনের উপর একটার পর একটা দায় নেমে এসেছে। শান্তিনিকেতনে থাকলে কোনো মতেই বহন করতে পারা যেত না। আবার ছুটে আসতে হতো কলকতায়। তখন ফ্ল্যাট পাওয়া আরো কঠিন হতো। আমরা পরে ভেবে দেখেছি যে ওই দুর্ঘটনাটা ছিল শাপে বর। ওটা যদি না ঘটত তা হলে আমরা শান্তিনিকেতনে ফিরে যেতুম ঠিক সময়ে, কিন্তু পারিবারিক প্রয়োজনে পরে আবার কলকাতায় এসে হাজির হতে হতো। তখন না পারতুম আরো বেশী খরচ করে অন্য কোনো ফ্ল্যাট খুঁজে নিতে, না পারতুম অপরের আশ্রয়ে বাস করতে।

এখন বলি কেমন করে দুর্ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনারের নিবাস থেকে আমার ফিরে আসার কথা যে সময়ে, সেই সময়ে ফ্ল্যাটের দরজায় কে একজন কড়া নাড়ে। আমার স্ত্রী ভাবেন আমিই। তিনি তখন সদ্য স্নান করে উঠেছেন। রান্নাঘরে

কী করছিলেন, কড়া নাড়া শুনে ছুটে আসতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যান। ভাঙা উরু নিয়ে কী কষ্টে যে দরজা পর্যন্ত এগোন তা বলবার নয়। দরজা খুলে দেখেন আমি নই। প্রতিবেশিনীকে ডাকেন। তিনি তাঁর স্বামীকে গাড়ি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। সে ভদ্রলোক আপিসে যাবার জন্যে বেরিয়েছিলেন, আপিসে না গিয়ে ডাক্তার বন্ধুকে ডেকে আনেন, আমার বড় ছেলেকেও খবর দেন। ভাগ্যক্রমে সেও তখন কলকাতায় তার শ্বশুরবাড়িতে।

যার জন্যে এত কাণ্ড তিনি কিন্তু এলেন না আমাদের একুশে ফেব্রুআরির অনুষ্ঠানে। হাসান ইমাম সাহেব নাকি ঢাকা থেকে তলব হয়ে সেখানকার কর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেছেন, আমাদের কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলেন না। এদিকে আমার এই বিপদ। আমার স্ত্রীকে হাসপাতালে ফেলে রেখে আমি যাই একুশে ফেব্রুআরির সভায় সভাপতিত্ব করতে। না গেলে কর্তব্যহানি হতো।

"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" এটা পরে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হয়। কিন্তু চার বছর আগেও নিষিদ্ধ ছিল। আমি সভাপতি হিসাবে নির্দেশ দিই সেটি আমাদের সভায় গাইতে। পূর্বপাকিস্তানীরা কী মনে করবে বলে এতদিন ওটি গাইতে দেওয়া হয়নি। আমরা আগে যেসব অনুষ্ঠান করেছি সেসব ওদের মন মেজাজ বুঝে। এবার আমি বেপরোয়া। আমার সভাজনও তাই। সবাই মিলে প্রাণ খুলে গাওয়া গেল—যে সঙ্গীত পরে বাংলাদেশকে স্বাধীনতার প্রেরণা দেয়। এখনো যা ওরা ত্যাগ করতে পারেনি। যদিও গ্রহণ করেছে বলেও প্রত্যয় হয় না। স্বাধীনতার পর তিনবার বাংলাদেশে গেছি। কোথাও শুনতে পাইনি ও গান। কেবল সরকারী অনুষ্ঠানে বাজে ওর সুর। সবাই উঠে দাঁড়ায়। নীরব হয়ে শোনে।

হাসান ইমামের সঙ্গে পরে একবার আমার দেখা হয়ে যায় কী

একটা ফাংশনে। ভদ্রলোক নাটক ভালবাসতেন, নৃত্য ভালবাসতেন, সঙ্গীত ভালবাসতেন। মনে পড়ছে না ওটা কিসের ফাংশন। দু'চারটি কথা হলো। তারপর শুনি তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হয়ে বর্মায় বদলী হয়ে যাচ্ছেন। চিঠি লিখে অভিনন্দন জানাই। স্বাধীনতার পর ঢাকায় গিয়ে শুনি রেঙ্গুনে গিয়ে তাঁর অসুখ করে। তিনি মারা যান। শুনে মর্মাহত হই। স্বাধীনতা দেখে যেতেও পারলেন না। কীই বা এমন বয়স!

কিন্তু আমার জীবনের মোড় ঘুরে যায় তারই নির্বন্ধাতিশয্যে। অবশ্য বিধাতার ইচ্ছায়। তিনি নিমিত্তমাত্র। না, তাই বা কী করে বলি? তাঁকে আমাদের সভায় নিমন্ত্রণ করতে না গেলে তিনিও নিমন্ত্রণ করতেন না। নিমিত্ত হচ্ছেন আমাদের তরফের উদ্যোক্তারা। কিন্তু তাঁরাই বা তাঁর কাছে যান কেন? যান একুশে ফেব্রুআরির উপলক্ষে পূর্বপাকিস্তানীদের সঙ্গে হাত মেলাতে। সংস্কৃতির রাখী বাঁধতে। সুফলের আশা ছিল। চারবছর বাদে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেল। তার ছয়বছর বাদে দেখছি আবার যে কে সেই। মাঝখান থেকে আমারই জীবনের মোড় গেল ঘুরে। এটা জীবনদেবতারই নির্বন্ধ। একুশে ফেব্রুআরির অনুষ্ঠানটা উপলক্ষ।